Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল মাওয়া মৌ

রোলঃ 216020087

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল মাওয়া মৌ

রোলঃ 216020087

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল মাওয়া মৌ, আইডিঃ 216020087 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান-- উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

জান্নাতুল মাওয়া মৌ

আইডিঃ 216020087

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্রঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৩
যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা কী?	৪
যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতার প্রকারভেদ	৪
দুনিয়ার হাকিকত	৪
কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতা	৭
অল্পে তুষ্টির পরিচয়, গুরুত্ব ও ফজিলত	৮
অল্পে তুষ্টির ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা	১১
কোন ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্টি এবং কোন ক্ষেত্রে নয়	১২
কুরআন মাজিদের বক্তব্যে সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা কে	১২
দুনিয়াদার ও ঈমানদারের পার্থক্য	১৪
মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা	১৫
যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতার অন্তরায়সমূহ	১৬
দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা ও দারিদ্রতার মাহাত্ম্য	১৯
মহানবি (সঃ) এর দুনিয়া বিমুখতা এবং দুনিয়ার হাকিকত	২১
দুনিয়ার বিষয়ে অন্যান্য মহানবি (সঃ) অবস্থান	২৫
দুনিয়ার বিষয়ে অন্যান্য নবীদের (আঃ) অবস্থান	২৭
দুনিয়ার বিষয়ে সাহাবাদের (রাঃ) অবস্থান	২৯
দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সাহাবির বিস্ময়কর মন্তব্য	৩৬
দুনিয়ার বিষয়ে তাবেয়ীনদের অবস্থান	৩৭
দুনিয়া মুহাব্বাতের বহিঃপ্রকাশ	৩৮
দুনিয়ার মুহাব্বাতের কারণসমূহ	৩৯
দুনিয়ার মুহাব্বাতের পরিণতি	৪২
দুনিয়ার মুহাব্বাতের চিকিৎসা	৫০
সন্তানের সুশিক্ষায় দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা	৫৭
দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিয়ে সুরা তাকাসুরের সতর্কতা	৫৮
দুনিয়া কাফেরদের জন্য জান্নাত এবং মুমিনের জন্য জেলখানা	৬১
দুনিয়ামুখি না হওয়া আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন	৬২
উপসংহার	৬৪
তথ্যসূত্র (রেফারেন্স)	৬৫

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد نبينا وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি এই সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তার পরিবার পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের উপর। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ পরকালীন জীবনের ভয়-ভীতির বিষয়টি মাথায় রেখে পার্থিব জীবনে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে সর্বদা বিরত রেখে পারলৌকিক জীবন সর্বতোভাবে সুখ-শান্তিময় করার চেষ্টা করা। দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার বুকে কোনো ধরনের অন্যায়-অপকর্ম করা চলবে না; একমাত্র আল্লাহকে পূর্ণাঙ্গভাবে ভয় করে সতর্কতার সঙ্গে জীবন পরিচালনা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কোরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, 'যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেও মন্দকর্ম করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। 'তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি কোনো প্রকার জুলুম করেন না' -সূরা হামিম সিজদা: ৪৬। আমাদের জীবন কুরআনের আলোকে পরিচালনা করা উচিত। আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন দুনিয়ার সফলতার খোঁজ করতে গিয়ে আখিরাত যেন ছুটে না যায়। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবনের বিষয়টিকে নিকৃষ্ট ও নগণ্য আখ্যায়িত করে বলেন, "দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা–সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব–অহংকার এবং ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র"। অর্থাৎ, দুনিয়াদারদের নিকট দুনিয়ার নির্যাস ও সারসংক্ষেপ এর ব্যতিক্রম কিছু নয়।

যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা কী?

যুহুদ অর্থ দুনিয়া বিমুখতা হলেও এর মানে এই নয় যে তালি দেয়া কাপড় পরা, মানুষকে এড়িয়ে চলা, সমাজ থেকে দূরে থাকা, প্রতিদিন রোজা রাখা। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন- যুহুদ অবলম্বনকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু তিনি নতুন কাপড় পরতেন। কোন প্রতিনিধি দল আসলে সেজন্য পরিপাটি হতেন। জুমার দিন ও ঈদের দিনে নিজেকে পরিপাটি করতেন। মানুষের সাথে মিশতেন। মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করতেন, দ্বীনি বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে প্রতিদিন রোজা রাখা থেকে বারণ করতেন। বরঞ্চ 'যুহুদ' মানে হচ্ছে- হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন সেটা থেকেও বেঁচে থাকা। বিলাসিতা প্রকাশ ও অতিমাত্রায় দুনিয়া উপভোগ থেকে দূরে থাকা। এক কথায় দুনিয়ার মোহ থেকে বেঁচে পরকালের জন্য উত্তম সম্বল গ্রহণ করা। যুহুদের সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে [১]।

যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতার প্রকারভেদঃ

দুনিয়া বিমুখতা কয়েক প্রকার। হারাম কাজে লিপ্ত না হওয়ার যুহুদ। আর এটি করা ফরযে আইন। দ্বিধা-সংশয়যুক্ত কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। দ্বিধা-সংশয়ের স্তরভেদে এর যুহুদেরও স্তর রয়েছে। দ্বিধা-সংশয় শক্তিশালী হলে তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব, আর দ্বিধা-সংশয় কম হলে তা থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব। আরেক প্রকার যুহুদ হলো অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। যেমন, অনর্থক কথাবার্তা, দৃষ্টি, প্রশ্ন, সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। আরেক ধরণের যুহুদ হলো মানুষের কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা, নফসের ব্যাপারে যুহুদ, তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নফসের ওপর যে কোনো কাজকে সহজ মনে করা। সবচেয়ে উত্তম যুহুদ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কোনো কিছু চাওয়া ও তোমার প্রয়োজন বলা থেকে বিরত থাকা। সর্বোত্তম যুহুদ হলো যুহুদকে গোপন রাখা, আর সর্বাধিক কঠিন যুহুদ হলো ভাগ্যের ব্যাপারে যুহুদ। যুহুদ ও ওরা'আর মধ্যে পার্থক্য হলো, আখিরাতে যে সব কাজ উপকারে আসবে না সেসব কাজ ত্যাগ করাকে যুহুদ বলে, আর আখিরাতে যেসব কাজের ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় সেসব কাজ ত্যাগ করাকে ওরা'আ বলে। যেসব অন্তর শাহওয়াত তথা প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত তাতে যুহুদ ও ওরা'আ সঠিকভাবে কাজ করে না।

দুনিয়ার হাকীকত

সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে কুরআনুল করীমের বিভিন্ন জায়গায় মানবজাতিকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেন,

﴿ِلَٰوۡمَأۡلٱ يِف ٞرُثاَكَتَو ۡمُكَنۡيَب ُۢرُخاَفَتَو ٞةَنيِزَو ٞوۡهَلَو ٞبِعَل اَيۡنُّدلٱ ُةٰوَيَحۡلٱ اَمَّنَأ ْآوُمَلۡعٱ
ٗماَطُح ُنوُكَي َّمُث ّٗارَفۡصُم ُهٰىَرَتَف ُجيِهَي َّمُث ۥُهُتاَبَن َراَّفُكۡلٱ َبَجۡعَأ ٍثۡيَغ ِلَثَمَك ِۖدَٰلۡوَأۡلٱَو
ِروُرُغۡلٱ ُعٰتَم اَّلِإ ٓاَيۡنُّدلٱ ُةٰوَيَحۡلٱ اَمَو ۚٞنٰوۡضِرَو ِهَّللٱ َنِّم ٞةَرِفۡغَمَو ٞديِدَش ٞباَذَع ِةَرِخٓأۡلٱ يِفَو ٢٠ ﴾
[الحديد: 20[

তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা–সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব–অহংকার এবং ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়–কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২০]। আয়াতের তাফসীর: আল্লামা কুরতবী রহ. বলেন, এ আয়াতে ما শব্দটি সম্পর্ক স্থাপনকারী। আয়াতের অর্থ হল, তোমরা জেনে রাখ! দুনিয়ার জীবন হল, নিষ্ফল ও অনর্থক খেলাধুলা এবং আনন্দদায়ক কৌতুক ও বিনোদন। তারপর তা অচিরেই নি:শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লামা কাতাদাহ রহ. বলেন, ক্রীড়া ও কৌতুক শব্দদ্বয়ের অর্থ হল, খাওয়া ও পান করা। অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন হল, কেবলই খাওয়া ও পান করার নাম; এ ছাড়া আর কিছু না। আবার কেও কেও বলেন, শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই এখানে উভয় শব্দ তার নিজস্ব অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। আল্লামা মুজাহিদ রহ. বলেন, শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; দুটির অর্থ একই। অর্থাৎ, সব খেলাধুলাই কৌতুক আবার সব কৌতুকই খেলাধুলা [২]।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবনের বিষয়টিকে নিকৃষ্ট ও নগণ্য আখ্যায়িত করে বলেন, “দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা–সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব–অহংকার এবং ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র”। অর্থাৎ, দুনিয়াদারদের নিকট দুনিয়ার নির্যাস ও সারসংক্ষেপ এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেনঃ

“মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালবাসা– নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যখেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ সামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪]। তারপর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবনের একটি উপমা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুনিয়ার জীবন হল, সাময়িক চাকচিক্য ও সৌন্দর্য এবং ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত; যার কোন স্থায়িত্ব নেই। তিনি আরও বলেন, দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত হল সেই বৃষ্টির মত; যে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করতে করতে মানুষ হতাশ হয়, তারপর হঠাৎ বৃষ্টি এসে যায়। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

"আর তারা নিরাশ হয়ে পড়লে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসিত। [সূরা শূরা, আয়াত: ২৮] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বাণী: أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ অর্থ, বৃষ্টির দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদের খুশি করে ও আনন্দ দেয়। যেমনি ভাবে বৃষ্টির দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদের খুশি করে এবং আনন্দ দেয়, অনুরূপভাবে কাফেরদেরও দুনিয়ার জীবন সাময়িক খুশি করে এবং আনন্দ দেয়। কারণ, তারা দুনিয়ার জীবনের প্রতি সর্বাধিক আসক্ত ও লোভী এবং দুনিয়ার সব মানুষের তুলনায় তারাই দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর উৎপাদিত ফসল শুকিয়ে যায়, তখন তুমি দেখতে পাবে ফসলগুলো হলুদ বর্ণের। অথচ এসব ফসল একটু আগেও তরতাজা ও সবুজ বর্ণের ছিল। তারপর তুমি দেখতে পাবে এ ফসলগুলো সব শুকিয়ে খড়-কুটো ও ধুলায় পরিণত। এটিই হল দুনিয়ার জীবনের উপমা ও দৃষ্টান্ত; প্রথমে দুনিয়ার জীবনকে আমরা দেখতে পাই সবুজ শ্যামল ও তরতাজা। তারপর ধীরে ধীরে তা দুর্বল হতে থাকে। অতঃপর একটি সময় আসে, তখন সে বুড়ো হয়ে যায়; তার নিজস্ব কোন শক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্ম ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে না। একজন মানুষ তার জীবনের শুরুতে তরতাজা ডালের মত যুবক, কর্মক্ষম ও শক্তিশালী থাকে; তা শক্তি সামর্থ্য বাহাদূরী ও কর্মতৎপরতা মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং মানুষ তাকে দেখে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়। তারপর সে ধীরে ধীরে বার্ধক্যের দিকে ধাবিত হতে থাকে, অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়; কর্মক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্য লোপ পায় এবং বার্ধক্য তার উপর অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণ ও আগ্রাসন চালায়। ফলে সে ধীরে ধীরে একেবারেই নি:শক্তি, দুর্বল, কুনকুনে বুড়ো হয়ে যায়; এখন আর নড়চড় করতে পারে না এবং কোন কিছুই জয় করতে পারে না; সবকিছু তাকেই জয় করে। যার হুংকারে থরথর করত মাটি, আজ সে মাটিতেই লোকটি গড়াগড়ি করে; নিজের শরীর থেকে কর্দমাক্ত মাটিগুলো পরিষ্কার করার কোন শক্তি তার নেই। আহ! কি করুণ পরিণতি! কি নিদারুণ এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও এরশাদ করেনঃ

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ قُوَّةٗ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٖ ضَعۡفٗا وَشَيۡبَةٗۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡقَدِيرُ ٥٤﴾ [الروم: 54].
"আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল বস্তু থেকে এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শক্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান"। [সূরা রুম, আয়াত: ৫৪]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দৃষ্টান্ত ও উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে, দুনিয়ার জীবনের অবস্থা ও পরিণতি কি হবে এবং তাদের গন্তব্য কোথায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে আরও

জানিয়ে দেন, দুনিয়ার জীবন কখনোই চিরস্থায়ী নয়, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়ার জীবন নি:সন্দেহে শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী যার শুরু আছে শেষ নাই। আখিরাতের জীবনে মানুষ অনন্ত অসীম কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। অত:পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং আখিরাতের অফুরন্ত, অসংখ্য, অগণিত ও চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহের প্রতি অগ্রসর হতে তাগিদ ও নির্দেশ দেন [৩ - ৫]।

কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতাঃ

আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্ব জাহানকে হরেক রকমের নাজ-নিয়ামত, ভোগ্যপণ্য ও বিলাসিতার উপকরণ দিয়ে সুশোভিত করে সৃষ্টি করেছেন। আর এসব চিত্তাকর্ষণীয় জিনিসের প্রতি মানুষের রয়েছে অধিক আগ্রহ ও মোহনীয় উদ্রেক। আল্লাহ তায়ালা নিজেই কুরআনে ইরশাদ করেছেন, ‘মানবকুলকে মোহগ্রস্ত’ করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ^, গবাদিপশুরাজি এবং ক্ষেতখামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আল্লাহর কাছেই হলো উত্তম আশ্রয়স্থল’ (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১৪)। মূলত মানুষের জীবনের গতিধারা দুটি পর্যায়ে বিভক্ত- একটি হলো পার্থিব জীবন অন্যটি পরকালীন জীবন। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী আর পরকালীন জীবন চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে পার্থিব জীবনের আমল-আখলাক ও কর্মকাণ্ডের ওপর। কাজেই মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জীবনটা খুবই গুরুত্ববহ; ভালো-মন্দ যা কিছু অর্জন করতে হয় তা এ জীবনেই করতে হয়, মৃত্যুর পর কোনো কিছু করার শক্তি-সামর্থ্য আর থাকে না। পরকালীন জীবনে সফলতা অর্জন করতে হলে দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহ ও রাসূল সা: প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। বিচার-বিশ্লেষণ করে বিবেককে কাজে লাগিয়ে দুনিয়ার মোহ, লোভ-লালসা, জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসিতা ত্যাগ করে দুনিয়ার ওপর পরকালকে প্রাধান্য দিতে পারলে উভয় জগতে সফলতা লাভ করা সম্ভব। কিন্তু দুনিয়ার মোহ মানুষকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে যে, সে পরকালের কথা ভুলেই গেছে। মৃত্যু নামক চিরসত্য বিষয়টি দুনিয়ার চাকচিক্যময় আবেগে তার স্মৃতিপট থেকে বিলীন হয়ে গেছে।

সূরা আততাকাসুরে আল্লাহ তায়ালা এ দৃশ্য চমৎকারভাবে অঙ্কন করেছেন। আল্লাহ বলেন, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটি সঙ্গত নয়, শিগগিরই তোমরা তা জানতে পারবে; আবার বলি, এটি সঙ্গত নয়, তোমরা শিগগিরই তা জানতে পারবে। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান কথাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না’ (সূরা তাকাসুর, আয়াতঃ ১-৫)। অর্থ-সম্পদ, প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসিতার পেছনে দৌড়াতে গিয়ে মানুষ দুনিয়াতে নানাবিধ অন্যায় ও অপকর্মের আশ্রয় নেয়; এতে দুনিয়াতে যেমন

সে আপমান-অপদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যদিকে আখিরাতের জীবনকেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। দুনিয়াতেও সে সফল নয়, আখিরাতেও সে সফল নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে আগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস' (সূরা নাজিয়াত, আয়াতঃ ৩৭-৪১)।

অল্পে তুষ্টির পরিচয়, গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

অল্পে তুষ্টি মুমিন চরিত্রের ভূষণ। সুখী জীবন লাভের অন্যতম হাতিয়ার। অল্পে তুষ্টির এই অনন্য গুণটি যে অর্জন করতে পারে, জীবনের শত দুঃখ-কষ্ট ও অপূর্ণতায় তার কোন আক্ষেপ থাকে না। আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত জীবন-জীবিকায় তিনি পরিতৃপ্ত থাকেন। অল্পতে তুষ্ট থাকার মধ্যেই কল্যাণ ও সফলতার ভিত্তি প্রোথিত থাকে। কারণ অতিভোগী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও মাত্রাতিরিক্ত বিলাসী জীবন মুমিনের অন্তর থেকে আল্লাহভীতি দূর করে দেয়। ইবাদতের আগ্রহ নষ্ট করে ফেলে। মানুষকে চরম হতাশাগ্রস্থ ও অস্থির করে তোলে। তাই সুখী ও প্রশান্ত জীবন লাভের জন্য অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করা অপরিহার্য। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা অল্পে তুষ্টি বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশআল্লাহ।

অল্পে তুষ্টির আরবী প্রতিশব্দ হ'ল ক্বনায়াত (القناعة), যার অর্থ 'স্বল্প লব্ধ জিনিসে পরিতুষ্ট থাকা [৬]। পরিভাষায় বলা হয়, 'আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা [৭]। ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেনঃ 'অল্পে তুষ্টির অর্থ হ'ল অপর্যাপ্ত বিষয়ে তুষ্ট থাকা, অপ্রাপ্ত জিনিস পাওয়ার লোভ পরিত্যাগ করা এবং যা আছে তা নিয়েই প্রাচুর্যবোধ করা [৮]। ইয়াসির আব্দুল্লাহ আল-হূরী বলেনঃ 'অল্পে তুষ্টি হচ্ছে আল্লাহ তাক্বদীরে যা কিছু বণ্টন করেছেন এবং দিয়েছেন তাতে খুশি থাকা, হারাম বর্জন করে হালাল জিনিসে পরিতৃপ্ত থাকা এবং অভিযোগ ও রাগ পরিহার করে অন্তরকে সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দেওয়া [৯]।

অল্পে তুষ্টির আলোচনা করা অনেকটা সহজ হ'লেও এই মহান গুণ অর্জন করা ততটা সহজ নয়। তবে প্রকৃত ঈমানদার ও পরহেযগার বান্দাদের জন্য এই গুণ অর্জন করা কঠিন নয়। কিন্তু দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য এটা কঠিন বটে। কেননা শয়তান সব সময় মানুষকে লোভের মায়াজালে বন্দী করতে চায় এবং দুনিয়ার মোহে প্ররোচিত করে তাকে উদ্ভ্রান্ত জীবনের দিকে আহবান করে। সেকারণ পরিতুষ্ট জীবন লাভের জন্য ঈমান ও তাক্বওয়ার বলে বলীয়ান হয়ে সর্বদা শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখতে হয়।

অল্পে তুষ্টির গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলামের প্রতিটি দিকনির্দেশনায় মানবজাতির জন্য দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাছাড়া অল্পে তুষ্ট থাকা অন্তরের ইবাদত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর গুরুত্ব ও ফযীলত বিধৃত হয়েছে। নিম্নে অল্পে তুষ্টির গুরুত্ব ও ফযীলত আলোকপাত করা হলঃ

১. অল্পে তুষ্টি মযবূত ঈমানের পরিচায়কঃ

অল্পে তুষ্ট থাকা বান্দার ঈমানী মযবূতির পরিচায়ক। আল্লাহ ও তাঁর নির্ধারিত ফায়ছালার ওপর চূড়ান্ত বিশ্বাস ছাড়া কেউ স্বল্প জীবিকায় তুষ্ট থাকতে পারে না। প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বছরী (রহঃ) বলেনঃ ‘হে আদম সন্তান! আল্লাহ তোমাকে যা থেকে সতর্ক করেছেন, তা থেকে সতর্ক থাক। মানুষ তোমাকে যে ব্যাপারে [দরিদ্রতা] ভয় দেখায়, সেই ব্যাপারে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তোমার দুর্বল ঈমানের অন্যতম লক্ষণ হ’ল- আল্লাহর কাছে যা আছে তার চেয়ে তোমার উপার্জিত জিনিসের উপর তুমি বেশী নির্ভর কর [১০]। সুতরাং অল্পে তুষ্ট না থাকা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক এবং আল্লাহ প্রদত্ত অল্প জীবিকায় খুশি থাকা মযবূত ঈমানের পরিচায়ক।

২. পবিত্র জীবন লাভঃ

অল্পে তুষ্ট থাকার মাধ্যমে পবিত্র জীবন লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،

‘পুরুষ হৌক বা নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব’ (নাহল ১৬/৯৭)। এই আয়াতে ঈমান ও নেক আমলের পার্থিব পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেটা হ’ল পবিত্র জীবন। আলী ইবনে আবী তালেব, ইবনু আববাস, হাসান বছরী, ইকরিমা, ওয়াহাব ইবনু মুনাবিবহ (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানদের মতে এই আয়াতে ‘পবিত্র জীবন’ বলতে ‘অল্পে তুষ্ট জীবন’ বুঝানো হয়েছে [১১]। মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহর ঘোষণা হ’ল ‘আমি দুনিয়াতে তাকে অল্পে তুষ্টি, হালাল রিযিক্ব এবং নেক আমল সম্পাদন করার তাওফীক্ব দানের মাধ্যমে পবিত্র জীবন দান করব [১২]।

৩. অল্পে তুষ্টি সফলতার সোপানঃ

সমাজের বড় বড় ব্যবসায়ী, চাকুজীবী, উদ্যোক্তা প্রমুখ লোকদেরকে আমরা সফল ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকি। কিন্তু প্রকৃত সফলতার ভীত প্রোথিত থাকে ইসলাম ও অল্পে তুষ্টির মাঝে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ 'সেই ব্যক্তি সফলকাম যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক্ব দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে অল্পে তুষ্টি দান করেছেন [১৩]। অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ 'সেই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান, যে ইসলামের দিকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। তার জীবিকা পরিমিত এবং সে অল্পে তুষ্ট থাকে [১৪]।

৪. আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা অর্জনঃ

অল্পে তুষ্টি এমন একটি আধ্যাত্মিক সম্পদ, যা অর্জন করলে আল্লাহ ও মানবমন্ডলী উভয়ের ভালোবাসা অর্জন করা যায়। সাহ্ল ইবনে সা'দ আস-সা'দী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি কাজের আদেশ দিন, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেনঃ 'দুনিয়া বিমুখ হয়ে যাও, তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের কাছে যা আছে তার প্রতি লোভ করো না, তাহ'লে লোকেরা তোমাকে ভালোবাসবে [১৫]।

৫. অন্তরের ধনাঢ্যতা বাড়েঃ

মানুষ কখনো অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে সুখী হ'তে পারে না; বরং অর্থ-সম্পদকে সুখের একটি উপাদান বলা যেতে পারে মাত্র। কেননা সমাজে অনেক বিত্তশালী লোক আছে, তাদের অনেক অর্থ-সম্পদ থাকার পরেও অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে দরিদ্র বানিয়েছে। আবার এমন গরীব মানুষ আছে, তাক্বদীরে বণ্টিত রিযিক পেয়েই যে পরিতুষ্ট। আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হৃদয় নিয়ে সে সুখে-শান্তিতে দিন গুজরান করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছনঃ 'সম্পদের আধিক্য প্রকৃত ধনাঢ্যতা নয়; বরং প্রকৃত ধনাঢ্যতা হ'ল অন্তরের ধনাঢ্যতা [১৬]। আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেনঃ 'তোমার তাক্বদীরে আল্লাহ যা বণ্টন করে রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকবে, তাহলে মানুষের মাঝে সর্বাপেক্ষা ধনী হ'তে পারবে' [১৭]।

৬. আল্লাহর শুকরগুযার বান্দা হওয়ার সৌভাগ্যঃ

আল্লাহর নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা ফরয। কেননা মানব সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মাবজাতিকে তাঁর নে'মতের শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেনঃ 'দ্বীনের বুনিয়াদ দু'টি স্তম্ভের উপর ভিত্তিশীল। আর সেটা হ'ল যিক্র ও শুক্র। কেননা আল্লাহ বলেছেনঃ 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না' (বাক্বারাহ ২/১৫২) [১৮]। আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম উপায় হ'ল অল্পে তুষ্ট থাকা। রাসূল (ছাঃ) একবার আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ 'হে

আবূ হুরায়রা! তুমি আল্লাহভীরু হয়ে যাও, তাহ’লে লোকেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হতে পারবে। তুমি অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহলে লোকেদের মধ্যে সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ বান্দা হ’তে পারবে’ [১৯]।

৭. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনঃ

তাক্বদীরের প্রতি যার ঈমান যত মযবূত, অল্পে তুষ্ট থাকা তার জন্য ততটাই সহজ। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত রিযিকে সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে। কেননা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হ’ল তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে মন্দ তাক্বদীর দিয়ে বেশী পরীক্ষা করে থাকেন। ভাল তাক্বদীরকে সবাই মেনে নিতে পারে। কিন্তু মন্দ তাক্বদীরকে সবাই মেনে নিতে পারে না। আবার তাক্বদীরের মন্দ ফায়ছালাকে মেনে নেওয়া এবং সেই মন্দ ফায়ছালার উপর সন্তুষ্ট থাকাও এক নয়। কেননা যে ব্যক্তি কোন উপায় না পেয়ে মন্দ তাক্বদীরকে মেনে নেয়, আর যে ব্যক্তি তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় এই দু’জনের ঈমান কখনো সমান নয়। সুতরাং যারা আল্লাহ কর্তৃক তাক্বদীরের নির্ধারিত ফায়ছালার উপর সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ ‘নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। ফলে তাতে যে সন্তুষ্ট হবে, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে (আল্লাহর পরীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি’ [২০]। সুতরাং যারা অল্পে পরিতুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং যারা অল্পে তুষ্ট থাকে না, তাদের প্রতি নাখোশ হন।

অল্পে তুষ্টির ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনাঃ

অল্পে তুষ্ট জীবনই প্রকৃত সুখের জীবন। ইসলাম মানুষকে সেই সুখী জীবন গঠনে উৎসাহিত করে। কেননা সম্পদের প্রতি মানুষের যে অস্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে, তা মানুষকে আমৃত্যু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যারা লোভের মুখে লাগাম টেনে স্বভাবগত এই রিপু শক্তিকে জয় করতে পারে এবং নিজের যা আছে তা নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকতে পারে, তাদের জন্য দুনিয়াটা হয়ে যায় সুখের নীড়। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অল্পে তুষ্টির নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ ‘আমরা তাদের ধনিক শ্রেণীকে যে বিলাসোপকরণ সমূহ দান করেছি, তুমি সেদিকে চোখ তুলে তাকাবে না। আর তাদের ব্যাপারে তুমি দুশ্চিন্তা কর না। ঈমানদারগণের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনত রাখ’ (হিজর ১৫/৮৮)। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, ‘এই আয়াতে মানুষকে অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করতে নিষেধ করা হয়েছে’ [২১]। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ

নির্দেশ দিয়েছেন, 'তুমি কামনার দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেক না' [২২]।

কোন ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্টি এবং কোন ক্ষেত্রে নয়ঃ

অল্পে তুষ্ট থাকার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে এবং এটা স্থায়ী হ'তে পারে, আবার অস্থায়ীও হ'তে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা (পার্থিব বিষয়ে) তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের দিকে তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ো না, যে তোমাদের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের। তাহ'লে তোমাদের জন্য এই পন্থা অবলম্বনই হ'বে আল্লাহর নে'মতকে অবজ্ঞা না করার উপযুক্ত মাধ্যম' [২৩]। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, 'মানুষের স্বভাব হ'ল সে যখন কারো মাঝে দুনিয়ার কল্যাণ দেখতে পায়, তখন সে নিজের মধ্যে অনুরূপ কল্যাণ কামনা করে। আর নিজের কাছে থাকা আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতকে সে কম মনে করে থাকে। ফলে তার নে'মতের সাথে আরো যুক্ত হয়ে অপরের চেয়ে বেশী কিংবা সমান সমান হোক এটা সে কামনা করে। এটা অধিকাংশ লোকের স্বভাব বা প্রকৃতি। কিন্তু মানুষ যদি তার নিচের দিকে তাকাত, তাহ'লে তার নিজের ওপর আল্লাহর দেয়া নে'মতরাজির বিষয়টি প্রকাশ পেত। ফলে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করত এবং আল্লাহর কাছে নত হয়ে ইবাদত-বন্দেগী করত' [২৪]।

আব্দুললাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেনঃ 'দু'টি কাজে মুক্তি রয়েছে- তাক্বওয়া ও একনিষ্ঠ নিয়ত। আর ধ্বংস হ'ল দু'টি কাজে- (আল্লাহর রহমত থেকে) নিরাশ হওয়া এবং আত্মতুষ্টি বা নিজের আমল নিয়ে আত্মগরিমা' [২৫]। একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল- 'আত্মতুষ্টি' কি জিনিস?' তিনি বললেনঃ 'এরকম অনুভব করা যে, তোমার এমন আমল আছে, যা অন্যের কাছে নেই (অর্থাৎ তুমি মনে মনে ভাবো যে, তুমি এমন আমল করো, যা অন্যেরা করে না)। মুছল্লীদের জন্য আত্মতুষ্টির চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোন কিছু আছে বলে আমার জানা নেই' [২৬]।

কুরআন মাজীদের বক্তব্যে সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগাঃ

সবাই জীবনে সুখী হতে চায়। সৌভাগ্যবান হতে চায়। নিরাপদে, স্বস্তিতে, শান্তি ও প্রশান্তিতে জীবন যাপন করতে চায়। সেজন্য প্রত্যেকেই তার বুঝ ও বুদ্ধি অনুযায়ী চেষ্টা করে। সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী মেহনত করে। যোগ্যতা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয়। কিন্তু সুখ ও সৌভাগ্যের সংজ্ঞা সবার কাছে এক হয় না। ফলে প্রত্যেকে তার পরিচিত সংজ্ঞা অনুযায়ী সুখ চায়। নিজেদের বুঝ ও বিবেচনা অনুযায়ী সৌভাগ্য লাভের আশা করে।

সুখী ও সৌভাগ্যবান মানুষ বলতে সমাজে এমন লোকদেরকে বোঝানো হয়, জাগতিক জীবনে যাদের প্রায় সকল চাহিদা পূর্ণ হয়। কাঙ্ক্ষিক্ষত অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান থাকে। সম্মান ও মর্যাদা এবং ক্ষমতা ও পদ-পদবী থাকে। সবাই জানে, উপরোক্ত সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে কারো পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। সেজন্য এসব বিষয়ে যে যতটা অগ্রসর থাকে, তাকে ততটা সুখী ও সৌভাগ্যবান মনে করা হয়। কোনো সন্দেহ নেই— দুনিয়ার এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়াবী জীবনের সুখ-দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়া কেন্দ্রিক সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যও ক্ষণস্থায়ী। সেজন্য প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্য হবে সেটাই, যা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে লাভ হবে কিংবা চিরস্থায়ী জীবন আখেরাতে লাভ হবে।

সংকটময় জীবনঃ

লক্ষ করার বিষয় হল, আল্লাহ তাআলার ঘোষণায় আছে— তার দুনিয়ার জীবনও হবে সংকীর্ণ। আর যে ব্যক্তি সংকীর্ণ ও সংকটময় জীবনের অধিকারী হবে, সে তো দুনিয়াবী দৃষ্টিতেও হবে দুর্ভাগা। তার দুনিয়ার জীবন সংকটময় কীভাবে হবে— সে বিষয়ে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. লেখেন— বাহ্যিকভাবে যদিও তার কাছে বিপুল ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী থাকে, তবে তার অন্তরে অল্পেতুষ্টি ও তাওয়াক্কুলের গুণ না থাকার কারণে সর্বাবস্থায় কেবল দুনিয়ার লোভ, অধিক সম্মান, সম্পদ ও উন্নতি লাভের চিন্তা এবং যে কোনো সময় অভাবে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় সে থাকে উৎকণ্ঠিত। সে কখনোই অর্থার্জনের লোভ-লালসা থেকে বের হতে পারে না। উপরন্তু বয়সের আধিক্য, শারীরিক দুর্বলতা ও নিশ্চিত মৃত্যুর চিন্তা এবং যে কোনো প্রেক্ষাপটে সকল ধন-সম্পদ ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় তার জন্য স্বতন্ত্র অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য তাদের অনেককেই দেখা যায়, রাতদিনে মাত্র দুয়েক ঘণ্টা কিংবা সর্বোচ্চ তিন চার ঘণ্টা ঘুমাতে পারে। অনেকে নানা দুশ্চিন্তায় অসহ্য হয়ে জীবনের উপর মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়ে আত্মহত্যা করে। কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য এবং বাস্তব জীবনের বহু অভিজ্ঞতা এ সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর যিকির ও তাঁর নির্দেশ পালন ছাড়া কিছুতেই কারো অন্তরে সুখ ও শান্তি অর্জন হয় না [২৭]।

মুত্তাকী ও দুর্ভাগাঃ

প্রকৃত সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগাদের সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

...فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى، لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى، الَّذِىْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى، وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى، الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى.

... অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে। তাতে নিপতিত হবে কেবল সেই ব্যক্তি, যে চরম দুর্ভাগা। যে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর

তা থেকে অবশ্যই রক্ষা পাবে সেই ব্যক্তি, যে পরম মুত্তাকী। যে তার ধন-সম্পদ দান করছে আত্মশুদ্ধির জন্য —সূরা লাইল (৯২) : ১৪-১৮।

এখানে দুর্ভাগার বিপরীতে আনা হয়েছে মুত্তাকীর কথা। বলা হয়েছে, মুত্তাকী সেই লেলিহান অগ্নি থেকে রক্ষা পাবে, যাতে নিপতিত হবে কেবল চরম দুর্ভাগা। এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়— ভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবান কারা এবং হতভাগা ও দুর্ভাগা করা। জাগতিক বিচারে যে অসুখী, অসচ্ছল, গরিব, অতি সাধারণ, মাজলূম ও নিঃস্ব; প্রকৃত বিচারে এবং আখেরাতের হিসাবে সেও হতে পারে চিরসফল, চিরসুখী ও মহাসৌভাগ্যবান। অপরদিকে জাগতিক বিচারে যে বিপুল ধন-সম্পদের মালিক, উচ্চ পদ ও পদবীর অধিকারী, ক্ষমতা ও লোকবলে অতি মাননীয়; প্রকৃত বিচারে এবং আখিরাতের হিসাবে সেও হতে পারে চরম ব্যর্থ, চিরদুঃখী ও নিতান্ত দুর্ভাগা। সেজন্য প্রকৃত সৌভাগ্যবান হওয়ার চেষ্টা করা এবং দৃষ্টিভঙ্গি শোধরানো আমাদের জরুরি কর্তব্য। সবকিছু কেবলই দুনিয়াবী হিসাবে বিবেচনা করার মানসিকতা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

দুনিয়াদার ও ঈমাদারের পার্থক্যঃ

মুমিনদের দুনিয়ার জীবন মুল লক্ষ্য হতে পারে না। তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হল আখিরাত। তাই মুমিনরা দুনিয়াতে তাদের যাবতীয় কর্ম দ্বারা আখিরাত লাভের চেষ্টা চালিয়ে যায়। দুনিয়া মুমিনদের জন্য আখিরাতের পথ চলার সাময়িক বিশ্রামাগার। পথিক যেমন পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কোথাও ছায়া তালাশ করে সেখানে বিশ্রাম নেয় অনুরূপ একজন মুমিনের জন্য আখিরাতের কল্যাণ হাসিলের লক্ষ্যে কাজ করতে করতে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। আর দুনিয়া হল, তাদের বিশ্রামাগার।

দুনিয়াদারের অবস্থা হ'ল অতিথিসম! যেন তার জন্য দস্তরখানা বিছানো হ'ল। এদিকে অতিথিপরায়ণ ব্যক্তির অভ্যাস হ'ল স্বীয় অতিথিবৃন্দের সামনে ঘর সাজানো, আগ্রহের সাথে অতিথিকে স্বাগত জানানো, এক দল সৈন্য বা গোত্রকে খাওয়ানোর পর আরেক দল সৈন্য বা গোত্রকে খাবারের প্রতি আহবান করা, তাদের সামনে ধূপসম্বলিত জহরতপূর্ণ সোনার পাত্র উপস্থাপন করা এবং ধূপ জ্বালানোর জন্য রূপার অংগার ধানিকা দান করা যেন অতিথিবৃন্দ তা থেকে সুগন্ধি লাভ করতে পারে। অতঃপর রীতি অনুযায়ী স্বর্ণ-রূপার পাত্র তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হয় যাতে পরবর্তী অতিথিবৃন্দকে তা দ্বারা আপ্যায়ন করতে পারে। এমতাবস্থায় আতিথেয়তার নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এগুলো ব্যবহার করতঃ সুগন্ধি লাভ করবে এবং বিদায়ের প্রাক্কালে পাত্রসমূহ মালিকের নিকট রেখে চলে যাবে এবং এর প্রতি কোন রকম লোভ-লালসা করবে না এবং তাদের হৃদয়ে এগুলোর প্রতি সামান্যতম চাহিদাও থাকবে না। বরং

সে পরিবেশক ও মেযবানকে কৃতজ্ঞতা জানাবে। কিন্তু এই সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি তথা দুনিয়া লোভী ধারণা করবে যে, এই পাত্রগুলোও তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সে বিদায়ের প্রাক্কালে পাত্রগুলো সাথে করে নিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু সে এগুলো নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ মালিক কর্তৃক তা ফেরত চাওয়া হবে। অতএব সে ভগ্ন প্রাণ ও মনমরা হয়ে পড়বে এবং নিজের কৃত ভুল কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হবে। বলাবাহুল্য দুনিয়া হচ্ছে পথিকের রাস্তা এবং অতিথিশালার মত। এখান থেকে মানুষ যেন শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। অতিথিশালা ও মেযবানের পাত্রের প্রতি কোন লোভ না করে।

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসাঃ

মানবজীবন দু'ভাগে বিভক্ত। একটি দুনিয়ার জীবন অপরটি আখেরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী হ'লেও আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। আখেরাতের জীবনের শুরু থাকলেও যেহেতু শেষ নেই সেহেতু দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের চেয়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনের প্রতি মানুষের পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত। একইভাবে দুনিয়ার জীবনের প্রতি অকারণে মোহ থেকে মানুষের বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। দুনিয়ার প্রতি মোহ ও ভালোবাসা সব অন্যায়ের মূল কারণ। আর দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ সব সৎ কর্মের মূল। দুনিয়া বিমুখতা অন্তর এবং শরীরকে প্রশান্তিতে রাখে। আর দুনিয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি বৃদ্ধি করে। ইসলামী দৃষ্টিতে কোনো বস্তু বাদ দিয়ে তার চেয়ে উত্তম বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করাকে যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা বলে। অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসাকে বের করে ফেলার নাম যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা। জীবনধারণের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করার নামও যুহুদ। রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীরা এ ধরনের যুহুদের মাঝেই জীবনাতিবাহিত করেছেন। অন্তরে দুনিয়ার প্রতি মোহ বা আকর্ষণ রেখে দুনিয়ার দরকারি কাজকর্ম পরিত্যাগ করার নাম যুহুদ নয়; বরং এটা মূর্খ ও অপারগদের যুহুদ। দুনিয়ার চাকচিক্য ও সম্পদের প্রতি অনীহা ও আখেরাতের শান্তির প্রতি আগ্রহী হয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করাই যুহুদ। মূলতঃ যুহুদ মানে হচ্ছে- হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ যা অপসন্দ করেন সেটা থেকেও বেঁচে থাকা। বিলাসিতা প্রকাশ ও অতিমাত্রায় দুনিয়া উপভোগ থেকে দূরে থাকা। পরকালের জন্য উত্তম সম্বল গ্রহণ করা। যুহুদের সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে নবী করীম (ছাঃ) জীবনীতে। যুহুদ অর্থ এই নয় যে, দুনিয়ার মানুষ ও সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল ইবাদতে মশগুল থাকবে। একজন সম্পদশালী মানুষও দুনিয়াবিমুখ বা যাহেদ হ'তে পারে।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ে

শুয়েছিলেন। পরে তিনি যখন জেগে দাঁড়ালেন তখন তাঁর পার্শ্বদেশে এর দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য যদি আমরা একটি নরম বিছানা বানিয়ে নিতে পারতাম! তিনি বললেন, আমার সঙ্গে দুনিয়ার কি সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়ায় সেই এক সওয়ারীর মত যে পথ চলতে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল পরে আবার সে তা পরিত্যাগ করে চলে গেল'।

দুনিয়াবিমুখতার অন্তরায়সমূহঃ

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সফলতা হ'ল অল্পে তুষ্টির গুণ লাভ করা। যারা এই বৈশিষ্ট্য লাভ করে সুখ-শান্তির জন্য তাদেরকে হাপিত্যেশ করতে হয় না। অনাবিল প্রশান্তিতে তাদের হৃদয় জগৎ সর্বদা ভরপুর থাকে। পক্ষান্তরে অল্পে তুষ্ট থাকতে না পারা চরম ব্যর্থতার পরিচায়ক। মানুষের প্রত্যেক পরাজয় ও ব্যর্থতার পিছনে যেমন মূখ্য ও গৌণ কিছু কারণ থাকে। তেমনি অল্পে তুষ্ট থাকতে না পারারও কিছু কারণ আছে। পরিতুষ্ট জীবন গঠনের জন্য এই কারণগুলো জানা উচিত, যেন তা আমাদের সুখ ও সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। নিম্নে কারণগুলো আলোকপাত করা হলঃ

১. তাক্বদীরের প্রতি দুর্বল বিশ্বাসঃ

অল্পে তুষ্ট না থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল তাক্বদীরের প্রতি দুর্বল বিশ্বাস। ঈমানের অন্যান্য শাখার প্রতি স্বচ্ছ বিশ্বাস থাকলেও, তাক্বদীরের মন্দ ফায়ছালার ক্ষেত্রে অনেক ধার্মিক মানুষের ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই হাদীছটি সর্বদা মনে রাখা উচিত, যেখানে তিনি বলেছেঃ 'আল্লাহ আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে সকল মাখলূক্বের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন' [২৮]। অর্থাৎ আমাদের জীবনের সকল কিছু পূর্ব নির্ধারিত। যেমন আমরা জীবনে কত টাকা উপার্জন করব, ধনী না-কি গরীব হব, কি পানাহার করব সব কিছুই আল্লাহ আগে থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোন প্রাণী তার তাক্বদীরে বণ্টিত রিযিক পরিপূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিলম্ব হ'লেও সে তা পেয়ে যাবে [২৯]।

তাক্বদীরের এই বিষয়গুলোর প্রতি মানুষের বিশ্বাস যখন নড়বড়ে হয়ে যায়, তখন সে অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে না এবং জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও বিপদাপদে অস্থির হয়ে পড়ে। আবার কখনো নিজের মন্দ ভাগ্যকে দোষারোপ করে থাকে। ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহঃ) বলেন, 'আমি সেই ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই, যে তাক্বদীরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আবার রিযিকের ব্যাপারে পেরেশান হয়ে পড়ে' [৩০]।

২. আখেরাতের উপর পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেওয়াঃ

যারা তাদের পরকালীন জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে চলেন, কেবল তারাই অল্পে তুষ্ট থাকতে সক্ষম হন। কেননা তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাতের জীবন বিনষ্ট করেন না। ফলে জীবন ধারণের জন্য সামান্য কিছু পেয়েই তারা খুশি থাকেন। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেন, তারা অল্পে তুষ্ট থাকতে পারেন না। কেননা তাদের চিন্তা-চেতনা দুনিয়া কেন্দ্রীক হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেনঃ 'বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখেরাত হ'ল উত্তম ও চিরস্থায়ী' (আ'লা ৮৭/১৬-১৭)।

আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেনঃ 'আমাদের সালাফগণ দুনিয়ার জন্য তা-ই রাখতেন, যা তাদের আখেরাত নিশ্চিত হওয়ার পরে অবশিষ্ট থাকত। অন্যদিকে তোমরা তোমাদের আখেরাতের জন্য তা-ই রেখে দাও, যা দুনিয়া নিশ্চিত হওয়ার পরে অবশিষ্ট থাকে' [৩১]। সালাফগণ আরো বলেনঃ 'দুনিয়া অন্বেষণকারীর উপমা হ'ল সাগরের (লোনা) পানি পানকারীর মত। সে যতই পান করে, তার তৃষ্ণা ততই বেড়ে যায়। তাই সে পান করতেই থাকে। অবশেষে সেই লবণাক্ত পানি তাকে হত্যা করে ফেলে' [৩২]। সুতরাং মানুষ পার্থিব জীবনকে যত অগ্রাধিকার দিবে, দুনিয়ার প্রতি তার আসক্তি ততটাই তীব্রতর হবে। ফলে তার জন্য অল্পে তুষ্ট থাকাও সুদূর পরাহত হবে।

৩. মৃত্যুকে কম স্মরণ করাঃ

অল্পে তুষ্ট না থাকার সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল মৃত্যুকে কম স্মরণ করা। কেননা যিনি তার চিন্তা-চেতনায় মৃত্যুর কথা মনে রাখেন, মৃত্যুর ভাবনায় নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন, তার মাঝে না থাকে না পাওয়ার আক্ষেপ এবং অধিক পাওয়ার তৃষ্ণা। অপরদিকে যার মধ্যে মৃত্যুর ভাবনা যত কম, দুনিয়া কেন্দ্রীক তার আশা-আকাঙ্ক্ষাও বেশী। ফলে অল্পে তুষ্ট থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'তোমরা দুনিয়ার স্বাদ হরণকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর' [৩৩]। মৃত্যুর চিন্তাই একজন মানুষের জীবনাচারকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করতে পারে। আর মরণের ভয় থেকে যারা গাফেল থাকে, তাদের জীবন হয় বল্গাহীন এবং তারা পার্থিব সামান্য ধন-সম্পদে কখনো পরিতুষ্ট থাকতে পারে না।

৪. বিত্তশালী ও বিলাসী লোকদের সাথে অধিক মেলামেশা করাঃ

অল্পে তুষ্ট না থাকার আরেকটি কারণ হ'ল অধিক বিলাসী এবং নিজের চেয়ে বিত্তশালী লোকদের সাথে ওঠাবসা ও মেলামেশা করা। সাধারণ পরিবারের কোন ব্যক্তি যদি বিত্তশালী লোকের বাসায় বেশী যাতায়াত করে এবং অধিক মেলামেশা করে, তখন তার জন্য অল্পে তুষ্ট থাকা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তখন সে তার বন্ধুর ঘরের আসবাব পত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত

জিনিসপত্র, গাড়ি-বাড়ি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রভাবিত হয় এবং নিজের জন্য সেরকম কামনা করতে থাকে। ফলে সে তার বন্ধুর মতো বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে এবং অল্পে তুষ্টির রাস্তা থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

একদিন আলী (রাঃ) ভাষণ দেওয়ার প্রাক্কালে জনতার উদ্দেশ্যে বলেনঃ 'হে লোক সকল! তোমরা সেই ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে আমল না করেই আখেরাতের জীবন প্রত্যাশা করে, দীর্ঘ আশা - আকাঙক্ষার কারণে তওবা করতে বিলম্ব করে, দুনিয়াদার হয়ে দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তির মতো কথা বলে, (বাহ্যিকভাবে) অতি আগ্রহী ব্যক্তিদের মতো আমল করে। তাকে কিছু দেওয়া হ'লে পরিতৃপ্ত হয় না। আবার কিছু না দেওয়া হ'লেও পরিতুষ্ট থাকতে পারে না। আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে সে অপারগ হয়ে যায় এবং তার কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও আরো অধিক কামনা করে। আর তোমরা সেই ব্যক্তির মতোও হয়ো না, গরীবদের সাথে যিকর করার চেয়ে ধনীদের সাথে আনন্দ-বিনোদন করা যার কাছে অধিক পসন্দনীয়' [৩৪]।

৫. দুনিয়াদারদের সাথে মেশাঃ

মানুষের মধ্যে অনুকরণ ও অনুসরণের প্রবণতা রয়েছে। সে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অন্যের অনুকরণ করে থাকে। ফলে ভালো মানুষের সাহচর্যে থাকলে, তার মাঝে ভালো গুণের সমাবেশ ঘটে। আর মন্দ লোকের সান্নিধ্যে গেলে, চরিত্রে ও চিন্তা-চেতনায় খারাপ গুণের প্রভাব পড়ে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন্দ লোকের সঙ্গী হওয়া থেকে আমাদের সতর্ক করেছেন। কেননা কেউ যদি পরহেযগার দ্বীনদার মানুষের সাথে মেশে, তার জীবন আখেরাতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু সে যদি দুনিয়াদার মানুষের সাথে মেশে, তার জীবনটা দুনিয়ামুখী হয়ে যায়। তাই অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য দুনিয়াসক্ত মানুষের সংশ্রব থেকে নিজেকে দূরে রাখা ঈমানী দায়িত্ব। তাই তো ওমর ফারূক (রাঃ) প্রায়ই উপদেশ দিয়ে বলতেনঃ 'তোমরা দুনিয়াদার লোকদের কাছে যেয়ো না। কেননা এটা রিযিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ' [৩৫]। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, 'যখন দেখি, কোন লোক দুনিয়ার প্রতি আসক্ত লোকদের সাথে বেশী মেলামেশা করছে, তখন বুঝতে পারি এই দুনিয়ার জীবনকেই সে ভালোবাসে' [৩৬]। আর দুনিয়াদার লোকেরা যে কখনো অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে না, তা সহজেই অনুমেয়।

৬. অধিক সম্পদ সঞ্চয়ের মানসিকতাঃ

সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবল চিন্তা মানুষকে অল্পে তুষ্ট থাকতে দেয় না। মানুষের আয়-রোযগার যত বাড়ে, তার ব্যাংক-ব্যালেন্স সমৃদ্ধ করার চাহিদাও তত বেড়ে যায়। লক্ষ-কোটি টাকা রোযগার করার পরেও সে কামনা করে ইনকামটা যদি আরেকটু বাড়ানো যেত! মূলতঃ দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা

থেকে মানুষের মাঝে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ জমানোর মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ফলে তার অল্পে তুষ্ট থাকার পথটাও রুদ্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অল্পে তুষ্ট মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখাতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-এর নিকট এলেন এবং তার ঘরে খেজুরের বড় স্তূপ দেখতে পেয়ে বললেনঃ বেলাল এসব কি?' বেলাল বললেনঃ 'এসব আমি ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রেখেছি'। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেনঃ 'তুমি কি কাল ক্বিয়ামতের দিনে এর থেকে জাহান্নামের তাপ অনুভবের ভয় করছ না? বেলাল! এসব তুমি দান করে দাও। আরশের মালিকের কাছে ভূখা-নাঙা থাকার ভয় করো না' [৩৭]। সুতরাং প্রয়োজনে শর্ত সাপেক্ষে এবং সীমিত পরিসরে সম্পদ সঞ্চয় করা বৈধ হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ ধন-সম্পদ জমানোর তীব্র নেশায় দুনিয়ামুখী ও বস্তুবাদী হয়ে পড়ে এবং অল্পে পরিতুষ্ট থাকতে ব্যর্থ হয়।

৭. আল্লাহর অনুগ্রহকে উপলব্ধি না করাঃ

আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তা-ই দিয়ে থাকেন, যেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তার স্থূল দৃষ্টি দিয়ে সেই কল্যাণ দেখতে পায় না। ফলে আল্লাহর অনুগ্রহরাজিকে উপলব্ধি করতে এবং অল্পে তুষ্ট থাকতে সে অপারগ হয়ে যায়। আল্লাহ কোন বান্দার জন্য দারিদ্রের মাঝে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, আবার কারো জন্য কল্যাণ রেখেছেন সম্পদের মাঝে। তিনি কাউকে ধন-দৌলত দিয়ে এবং কারো কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। কিন্তু বান্দা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হ'তে পারে না। উপরন্তু হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। কেননা সে শুধু ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারলেই ভীষণ আনন্দিত হয়। ধন-সম্পদ না থাকাও যে আল্লাহর অনুগ্রহ হ'তে পারে, এটা সে কল্পনা করতে পারে না।

৮. মুবাহ ও অপ্রয়োজনীয় কাজে অধিক আত্মনিয়োগ করাঃ

হালাল বা বৈধ কাজকে মুবাহ বলা হয়। পানাহার, ঘুমানো, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, সাধ্যের মধ্যে উন্নত পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি 'মুবাহ' কাজের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কেউ যদি বিনা প্রয়োজনে বৈধ কাজে অত্যধিক আত্মনিয়োগ করে, তাহ'লে এটা তার জীবনে কুফল বয়ে আনে। যেমন পরিবারের ভরণ-পোষণ এবং জীবন ধারণের জন্য যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন হয়, তার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য আল্লাহ ব্যবস্থা করেছেন। এক্ষণে কেউ যদি নিজের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রোযগার করার পরেও সম্পদের পাহাড় গড়ার জন্য ইবাদত-বন্দেগী বাদ দিয়ে ব্যবসায় অত্যধিক সময় ব্যয় করে, তাহ'লে এই ব্যবসা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তাকে

আখেরাত থেকে বিমুখ করতে পারে। তাই তো প্রথম খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেছেনঃ 'আমরা সত্তরটি হালালের দরজা বন্ধ করে দিতাম, এই ভয়ে যে, যদি হারামের কোন একটি দরজায় ঢুকে পড়ি' [৩৮]। সুতরাং কোন কিছু বৈধ হ'লেই যে সেটা ভোগ করতে হবে, এমন ধারণা পরিহার করা উচিত। বরং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ভোগ করা কর্তব্য।

দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা ও দারিদ্রতার মাহাত্ম্যঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন: "বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্টের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়, যা থেকে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পুর্ন অধিকরী, তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এরুপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা করে থাকি"। [সূরা ইউনুস ২৪]

তিনি আরও বলেন: "তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিস্ট হয়ে উদগত হয়। তারপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ন-বিচূর্ন হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ধনঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।" [সূরা কাহফ ৪৫-৪৬]

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন: "তোমার জেনে রাখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারম্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ন দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরো-টুকরো (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" [সূরা হাদীদ ২০ আয়াত]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন: "নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভাণ্ডার, পছন্দসই (চিহ্নত) ঘোরা, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা

হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্ত। আর আল্লাহর নিকতেই উওম আশ্রয়স্থল রয়েছে" [আলে ইমরান ১৪]।

তিনি আরো বলেন: "হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কোন প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে" [সূরা ফাত্বির ৫ আয়াত]।

আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন: "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা (মরে) কবরে উপস্থিত হও। কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি, কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। সত্যিই, তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (ঐ প্রতিযোগিতার পরিণাম)" [সূরা তাকাসুর ১-৫ আয়াত]।

তিনি আরও বলেন: "এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পরলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত" [সূরা আনকাবূত ৬৪ আয়াত]।

মহানবি (সঃ)এর দুনিয়া বিমুখতা এবং দুনিয়ার হাকিকতঃ

(১) এ মর্মে প্রচুর আয়াত ও হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হল: ১) আমর ইবনে আউফ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার আবূ উবাইদাহ ইবনে জারাহকে জিযিয়া (ট্যাক্স) আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। তারপর তিনি বাহরাইন থেকে (প্রচুর) মাল নিয়ে এলেন। আনসারগন তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে শরীক হলেন। যখন তিনি নামায পড়ে (নিজ বাড়ি) ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তারা তাঁর সামনে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে দেখে হেসে বললেন, "আমার মনে হয়, তোমরা আবূ উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু (মাল) নিয়ে এসেছে, তা শুনেছ।" তারা বলল, 'জী হ্যাঁ ।' তিনি বললেন, "সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে। তবে আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি এ আশংকা করছি না.বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে। আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল" [৩৯]।

(২) আবূ সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। তারপর তিনি বললেন, "আমি তোমদের উপর যার আশঙ্কা করছি তা হল এই যে, তোমাদের উপর শোভা ও সৌন্দর্য (এর দরজা) খুলে দেওয়া হবে" [৪০]।

(৩) উক্ত রাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। তারপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও ও নারীজাতির ব্যাপারে” [৪১]।

(৪) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সাঃ) বলেছেন, “হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন” [৪২]।

(৫) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত: নবী (সাঃ) বলেছেন, “তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে (সঙ্গে যায়) দাফনের পর দুটি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথেই থেকে যায়। সে তিনটি হল, (এক) তার পরিবারবর্গ, (দুই) তার মাল, (তিন) তার আমল। দাফনের পর তার পরিবারবর্গ ও মাল ফিরে আসে। আর তার আমল তার সাথেই থেকে যায়” [৪৩]।

(৬) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত: নবী (সাঃ) বলেছেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে হতে এমন এক ব্যক্তি নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। তারপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে?’ সে বলবে, ‘না। আল্লাহর কসম! হে প্রভু!’ আর জান্নাতীদের মধ্যে হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ায় সবচেয়ে দুখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে (মাত্র একবার) চুবানোর পর বলা হবে, ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি দুনিয়ায়তে কখনো কষ্ট দেখছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ গেছে?’ সে বলবে, ‘না। আল্লাহর কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি” [৪৪]।

(৭) মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “আখিরাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের করে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রে কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে” [৪৫]।

(৮) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত: একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বাজারের পাশ দিয়ে গেলেন। এমন অবস্থায় যে, তাঁর দুই পাশে লোকজন ছিল। তারপর তিনি ছোট কানবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগল ছানার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তার কান ধরে বললেন, “তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের পরিবর্তে এটাকে নেওয়া পছন্দ করবে?” তারা বললেন, ‘আমরা কোন জিনিসের বিনিময়ে এটা নেওয়া পছন্দ করব না এবং আমারা এটা নিয়ে করবই বা কি?’ তিনি বললেন, “তোমরা কি

পছন্দ কর যে, (বিনামুল্যে) এটা তোমাদের হোক?” তারা বললেন, ‘আল্লাহর কাসম! যদি এটা জীবিত থাকত তবুও সে ছোট কানের কারনে দোষযুক্ত ছিল। এখন সে মৃত (সেহেতু একে কে নেবে)?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট এই মৃত ছাগল ছানাটা যতটা নিকৃষ্ট, দুনিয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট” [৪৬]।

(৯) আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি (একবার) নবী (সাঃ) –এর সাথে মদীনার কালো পাথুরে যমীনে হাঁটছিলাম। উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়ল। তিনি বললেন, “হে আবূ যার! এতে আমি খুশী নই যে, আমার নিকট এই উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে, এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হবে অথচ তার মধ্যে থেকে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে। অবশ্য টা থাকবে যা আমি ঋণ আদায়ের জন্য বাকী রাখব অথবা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করব।”

তারপর (কিছু আগে) চলে তিনি বললেন, “প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। অবশ্য সে নয় যে সম্পদকে (ফোয়ারার মত) এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করে। কিন্ত এরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম।”

তারপর তিনি আমাকে বললেন, “তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে (ফিরে) আসছি।” এরপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলতে লাগলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হঠাৎ, আমি এক জোর শব্দ শুনলাম। আমি ভয় পেলাম যে কোন শত্রু হয়তো নবী (সাঃ)-এর সামনে পড়েছে। সুতরাং আমি তাঁর নিকট যাওয়ার ইছা করলাম, কিন্ত তাঁর কথা আমার স্মরণ হল, “তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে (ফিরে) আসছি।” সুতরাং আমি তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকলাম। (তিনি ফিরে এলে) “আমি বললাম,আমি এক জোর শব্দ শুনলাম, যাতে আমি ভয় পেলাম ।” সুতরাং যা শুনলাম আমি তা তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম।

তিনি বললেন, “তুমি শব্দ শুনেছিলে?” আমি বললাম, “জী হ্যাঁ” , তিনি বললেন, “তিনি জিবরাঈল ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, “আপনার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” আমি বললাম, “যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও কি?” তিনি বললেন, “যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে” [৪৭]।

(১০) আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এতে আনন্দিত হতাম যে, ঋণ পরিশোধের পরিমাণ

মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ করে ফেলি” [৪৮]।

(১১) উক্ত সাহাবী (সাঃ) থেকেই বর্ণিত: নবী (সাঃ) বলেছেন, “(দুনিয়ার ধন-দৌলত ইত্যাদির দিক দিয়ে) তোমারা মধ্যে যে নীচে তোমরা তার দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকায়ো না। যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না” [৪৯]।

(১২) বুখারীর বর্ণনায় আছে: “তোমাদের কেউ যখন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে তার থেকে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে এ বিষয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের।”

(১৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত: নবী (সাঃ) বলেছেন, “ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উওম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয় [৫০]।

(১৪) উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত: তিনি বলেন, ‘সওরজন (আহলে সুফফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে লুঙ্গী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দুটি বস্ত্রই কারো কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। তারপর সেই বস্ত্র কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত। সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়’ [৫১]।

(১৫) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বললেন: নবী (সাঃ) বলেছেন, “দুনিয়া মু’মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত।” [৫১

(১৬) ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) (একদিন) আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, “তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক।” আর ইবনে উমার (রাঃ) বলতেন, ‘তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর” [৫২]।

(১৭) আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা’দ (রাঃ) বলেন: এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) –এর কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কর্ম বলে দিন, আমি তা করলে যেন আল্লাহ

আমাকে ভালবাসেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসে।' তিনি বললেন, "দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকদের ধন-সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে" [৫২]।

(১৮) নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন: উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা করে ফেলেছে সে কথা উল্লেখ করে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) –কে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকর ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়) তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না' [৫৩]।

(১৯) আয়েশা (রাঃ) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন যে, তখন একটা প্রানীর খেয়ে বাঁচার মত কিছু খাদ্য আমার ছিল না। তবে আমার তাকের মধ্যে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে বেশ কিছুদিন আমি খেলাম। কিন্ত যখন একদিন মেপে নিলাম, সেদিনই তা শেষ হয়ে গেল" [৫৪]।

(২০) উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়্যাহ বিন্তে হারেসের ভাই আমর ইবনে হারেস (রাঃ) বলেন: 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় কোন দীনার, দিরহাম, ক্রেতদাসী এবং কোন জিনিসই ছেড়ে যাননি। তবে তিনি ঐ সাদা খচ্চরটি ছেড়ে গেছেন, যার উপর তিনি সওয়ার হতেন এবং তাঁর হাতিয়ার ও কিছু জমি; যা তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদকাহ করে গেছেন' [৫৫]।

দুনিয়ার জীবন বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবস্থানঃ

মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি ছিলেন মানবজীবনের সকল কল্যাণকর বিষয়ে সর্বোত্তম আদর্শ ব্যক্তিত্ব। কেননা তিনি জগৎবাসীর জন্য রহমত ও উসওয়াহে হাসানাহ বা 'সর্বোত্তম নমুনা' হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন (আম্বিয়া ২১/১০৭; আহযাব ৩৩/২১)। তিনি ছিলেন ঈমান ও ইয়াক্বীনের বলে বলীয়ান অল্পে তুষ্ট থাকা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এবং মানবজাতির জন্য অল্পে তুষ্ট জীবনের পথিকৃত। যারা ইন্দ্রিয়ের সর্বানুভূতির চিহ্ন ক্ষয় করে তাঁর আদর্শকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সেই আলোকে জীবন গড়তে সক্ষম হয়েছেন, তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তির ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অল্পে তুষ্ট জীবন বেছে নিয়েছিলেন এবং তাঁর মহান আদর্শের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতকে সেই জীবনের দিকে আহবান করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতে প্রেরণ করছে মানবজাতিকে দুনিয়ার অন্ধকার থেকে বের করে আলোর

সন্ধান দিতে এবং সরল পথ দেখাতে। দুনিয়ার রাজত্ব বা বাদশাহি করতে তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়নি। দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল না। তাকে দুনিয়ার নারী, বাড়ী, গাড়ী ও রাজত্ব সবকিছুই দেওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তিনি কোন কিছুই গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন আমি এক বেলা খাব অপর বেলা উপবাস থাকবো এটাই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। তিনি সাদাসিধে জীবন-যাপন করতে পছন্দ করতেন। কোন প্রকার উচ্চাভিলাষ ও রং তামাশা করতে পছন্দ করতেন না।

রাসূল (ছাঃ) তাঁর পরিবার-পরিজনকে অল্পে তুষ্টি, ধৈর্যশীলতা এবং দুনিয়াবিমুখতার দিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আখেরাতমুখী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। খায়বার যুদ্ধের পরে যখন মুসলমানদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল হ'ল, তখন মুহাজির ও আনছারদের স্ত্রীদের দেখাদেখি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণও খোরপোষের পরিমাণ বৃদ্ধি করার দাবী জানালেন। নবী করীম (ছাঃ) যেহেতু বিলাসহীন অনাড়ম্বর ও অল্পে তুষ্ট জীবন-যাত্রা পসন্দ করতেন, সেহেতু স্ত্রীদের এই দাবীতে মনঃক্ষুণ্ণ হ'লেন এবং এক মাসের জন্য স্ত্রীদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে একাকী বাস করা শুরু করলেন। অবশেষে আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, 'হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাস-ব্যসন কামনা কর, তবে এস আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের গৃহ কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যেকার সৎকর্মশীলদের জন্য মহা পুরস্কার প্রস্ত্তত করে রেখেছেন' (আহযাব ৩৩/২৮-২৯)।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে এটা শুনিয়ে তাকে সংসারে থাকা ও না থাকার ব্যাপারে এখতিয়ার দিলেন এবং বলে দিলেন, নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পিতা-মাতার পরামর্শ নিয়ে যা করার করবে। আয়েশা (রাঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, এই ব্যাপারে আববা-আম্মার সাথে পরামর্শ করার কি আছে? বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পসন্দ করি। অন্য সকল স্ত্রীগণও এই একই মত ব্যক্ত করলেন এবং কেউ রাসূল (ছাঃ)-কে ত্যাগ করে পার্থিব প্রাচুর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দিলেন না' [৫৬]।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দুনিয়ার সবকিছু তুলে ধরা হল এবং তাকে দুনিয়াদারি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেয়া হল। কিন্তু তিনি দুনিয়াকে গ্রহণ না করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। দু'হাত দিয়ে দুনিয়াকে না করেন এবং দুনিয়ার প্রস্তাবকে প্রতিহত করে দুনিয়াকে পিছনে ফেলে দেন। তারপর তার সাহাবীদের কাছে দুনিয়াকে তুলে ধরা হল এবং তাদের নিকটও দুনিয়া পেশ করা হল। তাদের কেউ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ অবলম্বন করল এবং দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করল; তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আবার তাদের মধ্যে কতক আছে যাদের নিকট দুনিয়াকে পেশ করা হলে তারা বলে, হে দুনিয়া! তুমি বল, তোমার মধ্যে কি কি রয়েছে? তখন বলা হল, হালাল, হারাম, মাকরুহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়ের সমন্বয়েই দুনিয়া। তখন তারা বলল, দুনিয়া থেকে যা হালাল তা আমাদের দাও, এছাড়া অন্য গুলোতে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। তারা দুনিয়ার হালাল বস্তুকে অবলম্বন করল আর হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করল। তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য দুনিয়াকে পেশ করা হলে, তারা বলল, দুনিয়ার হালাল বস্তুসমূহকে আমাদের জন্য রেখে যাও। তাদের জন্য হালাল বস্তুসমূহ তালাশ করে পাওয়া গেল না। তখন তারা মকরুহ ও সংশয়যুক্ত বস্তুসমূহ তালাশ করলে, দুনিয়া তাদের জানিয়ে দিল, তা তো তোমাদের পূর্বের লোকেরা গ্রহণ করে ফেলছে। তখন তারা বলল, তাহলে তুমি আমাদেরকে তোমার হারাম বস্তুসমূহ দাও, তখন তাদের হারাম বস্তুসমূহ দেয়া হলে তারা তা গ্রহণ করল। তারপর তাদের পরবর্তীরা দুনিয়া তালাশ করলে তাদের দুনিয়া জানিয়ে দেয় যে, দুনিয়া অত্যাচারীদের কবজায় চলে গেছে। তারা দুনিয়া বিষয়ে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। তখন তারা দুনিয়া হাসিলের জন্য অতি উৎসাহী হয়ে বিভিন্ন কলা, কৌশল ও তাল-বাহানা অবলম্বন করে। তখন অবস্থা এত নাজুক হবে যে, কোনো অপরাধী হারাম বস্তুর দিক হাত বাড়ালে দেখতে পাবে, তার চেয়ে আরও অধিক খারাপ ও শক্তিশালী অপরাধী তার প্রতি তার পূর্বেই হাত বাড়িয়ে আছে। অথচ একটি কথা মনে রাখতে হবে, দুনিয়াতে আমরা সবাই মেহমান, আমাদের হাতে যেসব ধন-সম্পদ আছে, তা সবই আমাদের নিকট আমানত। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ “দুনিয়াতে সবাই মেহমান, আর তার ধন-সম্পদ হল আমানত, মেহমান অবশ্যই বিদায় নেবে, আর আমানতকে প্রকৃত মালিকের নিকট আদায় করা হবে” [৫৬]।

এ ছিল নবী ও রাসূলগণের অবস্থা- তাদের যখন দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভ হত, তখন তাদের মধ্যে এ নিয়ে কোন কৌতূহল, উল্লাস বা আনন্দ পরিলক্ষিত হত না, তারা এ নিয়ে গর্ব, অহংকার করত না। আল্লামা কুরতুবি রহ. বলেন, কোন নবীই দুনিয়ার কোন বিষয় নিয়ে আনন্দ ও উল্লাস করেননি” [৫৭]।

দুনিয়ার বিষয়ে অন্যান্য নবীদের (আ) অবস্থানঃ

পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন আদিপিতা হজরত আদম আলাইহিস সালাম। তার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন, একইসঙ্গে মানুষকে হেদায়েতের জন্য আদিপিতাকে নবুওয়ত দিয়েছিলেন আল্লাহ তায়ালা। এরপর প্রতি যুগে সব মানুষের জন্য নবী-

রাসূল পাঠিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। নবুওয়তের এই ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَ لَقَدۡ بَعَثۡنَا فِیۡ کُلِّ اُمَّۃٍ رَّسُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ وَ اجۡتَنِبُوا الطَّاغُوۡتَ ۚ فَمِنۡہُمۡ مَّنۡ ہَدَی اللّٰہُ وَ مِنۡہُمۡ مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَیۡہِ الضَّلٰلَۃُ ؕ فَسِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ فَانۡظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُکَذِّبِیۡنَ

আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হিদায়াত দিয়েছেন আর তাদের কিছু সংখ্যকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল; কাজেই তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর অতঃপর দেখে নাও মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে (সূরা নাহল, আয়াতঃ ৩৬)। অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন,

رَبَّنَا وَ ابۡعَثۡ فِیۡہِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡہُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتِکَ وَ یُعَلِّمُہُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ وَ یُزَکِّیۡہِمۡ ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

হে আমাদের রব! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন; তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (সূরা বাকারা, (২), আয়াত, ১২৯)।

পবিত্র কোরআনের আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

عٰلِمُ الۡغَیۡبِ فَلَا یُظۡہِرُ عَلٰی غَیۡبِہٖۤ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارۡتَضٰی مِنۡ رَّسُوۡلٍ فَاِنَّہٗ یَسۡلُکُ مِنۡۢ بَیۡنِ یَدَیۡہِ وَ مِنۡ خَلۡفِہٖ رَصَدًا لِّیَعۡلَمَ اَنۡ قَدۡ اَبۡلَغُوۡا رِسٰلٰتِ رَبِّہِمۡ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَیۡہِمۡ وَ اَحۡصٰی کُلَّ شَیۡءٍ عَدَدًا

'তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসুল ছাড়া। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুলের সামনে ও পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন, রাসুলগণ তাঁদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কি না জানার জন্য। রাসুলদের কাছে যা আছে তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সব কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।' (সূরা জিন, (৭২), আয়াত, ২৬-২৮)।

এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি, আমার পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়া, ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ এবং আমার মা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার থেকে একটি আলো বের হল, যে আলোতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়েছে [৫৮]।

দুনিয়া বিষয়ে সাহাবীদের অবস্থানঃ

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সনিষ্ঠ অনুসারী। রাসূল (ছাঃ)-এর অল্পে তুষ্ট জীবনকে তারা খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁর জীবনাদর্শের দ্যূতি দিয়ে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনাচরণে চোখ বুলালে নববী আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। নিমেণ সংক্ষেপে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে অল্পে তুষ্টি শিক্ষা দিয়েছেন। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আমার সাথে এই ওয়াদা করবে যে, সে কারো কাছে ভিক্ষার হাত বাড়াবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিনদার হবো’। ছাওবান (রাঃ) বললেন, আমি। ফলে তিনি কারো কাছে কিছু চাইতেন না [৫৯]। এমনকি আরোহী থাকা অবস্থায় ছাওবান (রাঃ) এর হাত থেকে যদি চাবুক নিচে পড়ে যেতো, তিনি কাউকে বলতেন না- এটা আমাকে তুলে দাও। বরং তিনি নিজে বাহন থেকে নেমে সেটা তুলে নিতেন [৬০]।

(২) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীদের জীবনও ছিল সাদামাটা। বিশিষ্ট তাবেঈ হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, كُنْتُ أَدْخُلُ بُيُوْتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَأَتَنَاوَلُ سُقُفَهَا بِيَدِيْ، ‘আমি ওছমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে রাসূল (ছাঃ) স্ত্রীগণের ঘরসমূহে যাতায়াত করতাম। আমি তাদের ঘরের ছাদগুলো আমার দুই হাতের নাগালে পেতাম’ [৬১] অর্থাৎ উম্মাহাতুল মুমিনীনে বসবাসের ঘরে ছাদ এত নিচু ছিল যে, দুই হাতে সেই ঘরের ছাউনি নাগাল পাওয়া যেত।

(৩) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আহলুছ ছুফ্ফার সত্তর জন ছাহবীকে এমন দেখেছি যে, তাদের কারো কাছে গা ঢাকার জন্য চাদর ছিল না। কারো লুঙ্গী ছিল এবং কারো চাদর ছিল। কিন্তু এক সঙ্গে দু’টি বস্ত্র কারো কাছে ছিল না। তারা সেই কাপড়টি গলায় বেঁধে নিতেন। অতঃপর কাপড়টি কারো অর্ধগোছা পর্যন্ত এবং কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছত। আর তারা হাত দিয়ে জামা ধরে রাখতেন, যাতে লজ্জাস্থান দেখা না যায়’ [৬২]।

(৪) উরওয়া ইবনু যুবাইর (রহঃ) বলেন, একবার আমীর মু‘আবিয়া (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে এক লক্ষ দিরহাম হাদিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তার খাদেমার মাধ্যমে সেই দিরহামগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করা শুরু করলেন। আল্লাহর কসম! সন্ধ্যা হ’তে না হ’তেই সব দিরহাম ছাদাক্বাহ করে শেষ করে দিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি খাদেমাকে খাবার প্রস্ত্তত করতে বলেন। কিন্তু তার ঘরে পর্যাপ্ত খাবার ছিল না। তাই খাদেমা আয়েশা (রাঃ)-কে বলল, ‘আপনি যদি এক দিরহাম দিয়ে

কিছু গোশত কিনে রাখতেন, তাহ'লে খাবারের আয়োজন করা যেত'। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি আমাকে আগে স্মরণ করিয়ে দাওনি কেন, তাহ'লে তো আমি কিছু গোশত কেনার ব্যবস্থা করতাম [৬৩]। অর্থাৎ এতগুলো দিরহাম থেকে নিজের জন্য যে কিছু রাখতে হবে, সেটা তিনি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। সুতরাং সম্পদ সঞ্চয়কারী ও অপচয়কারী মুসলিম নর-নারীদের জন্য এই ঘটনাতে উপদেশ রয়েছে।

(৫) ছহীহ সনদে সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত আছে। আমের ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, যখন সালমান ফারেসী (রহঃ)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তাকে খুব পেরেশান ও অস্থির মনে হচ্ছিল। লোকেরা বলল, হে আবু আব্দিল্লাহ! আপনি এমন পেরেশান হচ্ছেন কেন? আপনার অতীত তো কল্যাণের সাথে অতিবাহিত হয়েছে। আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে অসংখ্য জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের বড় বড় বিজয়ে বীরোচিত অবদান রেখেছেন। তখন সালমান (রাঃ) বলেন, 'প্রিয় রাসূল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি বাণী আমাকে অস্থির করে তুলেছে। তিনি বলেছেন, لِيَكْفِ الْمَرْءَ مِنْكُمْ كَزَادِ الرَّاكِبِ 'তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির জন্য ততটুকু সম্পদই যথেষ্ট, যে পরিমাণ সম্পদ একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসাবে যথেষ্ট হয়'। রাবী বলেন, মৃত্যুর সময় সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর সম্পদের পরিমাণ ছিল মাত্র পনের দিরহাম। কোন কোন বর্ণনায় পনের দিনারের কথা উল্লেখ আছে [৬৪]। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, সালমান ফারসী (রাঃ) দুই ফালি কাপড় পরিধান করে খুৎবাহ দিতেন। এক ফালি লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করতেন, আর এক ফালি গায়ে জড়িয়ে নিতেন। যখন তাকে কেউ কোন কিছু হাদিয়া দিত, তিনি সেটা দান করে দিতেন। আর তিনি নিজ হাতে খেজুর পাতার পাটি বুনাতেন এবং সেটা বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করতেন' [৬৫]।

সালাফে ছালেহীনের অল্পে তুষ্ট জীবনঃ

সালাফে ছালেহীন বলতে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, তাবে তাবেঈন ও তৎপরবর্তী হেদায়াতপ্রাপ্ত সম্মানিত ইমামগণকে বুঝানো হয়। এছাড়া যারা তাদের সনিষ্ঠ অনুসারী এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হেদায়াতের পথে পরিচালিত হয়েছেন, তাদেরকেও সালাফে ছালেহীনের মাঝে গণ্য করা হয়। সালাফদের ত্যাগপূত জীবন আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তাদের জীবনের পরতে পরতেও আমরা অল্পেতুষ্ট থাকার প্রেরণা খুঁজে পাই। তাদের আদর্শ আমদের হৃদয়তন্ত্রীতে অপার্থিব শক্তি সঞ্চারিত করে। নিমেণ কয়েকজন সৎকর্মশীল সালাফের জীবনী থেকে অল্পেতুষ্টির কিছু নমুনা দেওয়া হলঃ

(১) প্রখ্যাত তাবেঈ আবু হাযেম আল-আশজা‘ঈ (রহঃ) ছিলেন আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর ছাত্র। তার জীবন ছিল অল্পে তুষ্টির অনন্য উদাহরণ। একবার এক উমাইয়া খলীফা আবূ হাযেম (রহঃ)-এর নিকট একটি চিঠি লিখে পাঠালেন এবং তার কোন কিছু প্রয়োজন আছে কি-না জানতে চাইলেন। আবূ হাযেম (রহঃ) পত্রের জবাব দিয়ে বললেন, ‘আপনার চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে। আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন- যেন আপনার কাছে আমার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করি। কিন্তু আমি তো আমার সব প্রয়োজন আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করেছি। তিনি আমাকে যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করেছি এবং আমার থেকে যা কিছু নিবৃত্ত রেখেছেন, সেই ব্যাপারে পরিতুষ্ট থেকেছি। সুতরাং আমাকে আপনার সাহায্য করার কোন প্রয়োজন নেই’ [৬৬]।

(২) মুক্বাতিল ইবনে ছালেহ খুরাসানী (রহঃ) বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (রহঃ)-এর একটি অভূতপূর্ব কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মুক্বাতিল (রহঃ) বলেন, একদিন আমি হাম্মাদ (রহঃ)-এর সাথে তার ঘরে বসে ছিলাম। হঠাৎ তার দরজায় কে যেন করাঘাত করল। তিনি তার ছোট মেয়েকে বললেন, ‘দেখ তো দরজায় কে এসেছে? মেয়েটি দেখে বলল, ‘মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমানের বার্তাবাহক’। মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ছিলেন তৎকালীন বছরার গভর্নর। তিনি মেয়েকে বললেন, ‘তাকে একা ঘরে ঢুকতে বল’। বার্তাবাহক একাই ঘরে ঢুকল এবং সালাম দিয়ে তার হাতে একটা চিঠি দিতে চাইল। হাম্মাদ (রহঃ) তাকে বললেন, ‘তুমিই পড়ো!’। এরপর সে চিঠিটা পড়তে লাগল। চিঠির মূল বক্তব্যে বলা হয়েছিল, ‘আমরা একটি মাসআলার সম্মুখীন হয়েছি। এই বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাই। আপনি দয়া করে আমাদের কাছে আসবেন’। চিঠি পড়া শেষ হ’লে হাম্মাদ (রহঃ) মেয়েকে কালি আনতে বললেন এবং বাহককে বললেন, ‘পত্রের অপর পাতায় লেখো ‘কোন মাসআলা জানার থাকলে আমাদের কাছে আসবেন। যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করবেন। তবে একাকী আসবেন। কোন আশ্বারোহী ও দলবল নিয়ে আসবেন না। এরকম করলে আপনার প্রতি এবং আমার নিজের প্রতিও কোন প্রকার শুভ কামনা থাকবে না, ওয়াস্সালাম’। বাহক চিঠির উত্তর নিয়ে চলে গেল। মুক্বাতিল (রহঃ) বলেনঃ আমি আগের মতোই বসে আছি। হঠাৎ কেউ একজন দরজায় করাঘাত করল। তিনি তার মেয়েকে বললেন, দেখো! দরজায় কে এসেছে। মেয়েটি দেখে বলল, ‘মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান’। বললেন, ‘তাকে ভিতরে আসতে বল’। গভর্নর মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার সামনে বসে কথা বলা শুরু করলেন। গভর্নর বললেনঃ ‘আপনার দিকে তাকালে আমি ভীতু হয়ে পড়ি। এটা কেন হয়?’। হাম্মাদ (রহঃ) বললেনঃ ‘আলেম যখন তার জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তখন সবাই তাকে ভয় করে। আর সে যখন জ্ঞান দ্বারা ধন-ভান্ডার বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করে, তখন নিজেই অপরের ভয়ে তটস্থ থাকে’।

এরপর গভর্নর তার কাছে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল জেনে নিলেন। তারপর হাম্মাদ (রহঃ)-কে বললেন, আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে?' তিনি বললেনঃ 'দিতে পারেন, যদি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোন ক্ষতি না হয়'। গভর্নর বললেন, 'আপনাকে চল্লিশ হাযার দিরহাম হাদিয়া দিতে চাচ্ছি, এটা আপনার প্রয়োজনে কাজে লাগাবেন'। তিনি বললেন, 'যাদের প্রতি আপনি অন্যায় করেছেন, এটা তাদেরকে দিয়ে দিন'। গভর্নর বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি মীরাছ সূত্রে সেটা পেয়েছি, সেখান থেকেই আপনাকে দিচ্ছি'। তিনি বললেন, 'আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার কাছ থেকে এগুলো সরান, আপনার কাছে থেকেও আল্লাহ এগুলো সরিয়ে রাখুন'। এবার গভর্নর বললেন, 'যদি অন্য কিছু দেই, নেবেন তো?' তিনি বললেন, 'দিতে পারেন, যদি দ্বীনের ব্যাপারে কোন ক্ষতি না হয়'। তখন গভর্নর বললেন, 'এগুলো নিয়ে আপনি মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিবেন'। হাম্মাদ (রহঃ) বললেন, 'বণ্টন তো ঠিকই করতে পারি। কিন্তু আমি ইনসাফ বজায় রাখলেও কেউ হয়ত না পেয়ে বলবে আমি ইনছাফ করিনি, তখন সে গুনাহগার হবে। সুতরাং এগুলো আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিন। আল্লাহ আপনাকে এসবের বোঝা থেকে মুক্ত করুন' [৬৭]। অল্পে তুষ্টি এমন বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। আল্লাহ আমাদেরকে এখান থেকে উপদেশ হাছিল করার তাওফীক্ব দান করুন।

(৩) সমকালীন কতিপয় মনীষী অল্পে তুষ্টির গুণে নিজেদের জীবনকে গুণান্বিত করেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হ'লেন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ)। তিনি ছিলেন মৌরিতানিয়া বংশোদ্ভূত একজন দুনিয়া বিমুখ আলিমে দ্বীন ও বিদগ্ধ মুফাসসির। আব্দুল আযীয বিন বায, ছালেহ আল-উছায়মীন, ড. বকর আবূ যায়েদ (রহঃ), ছালেহ আল-ফাওযান (হাফিঃ) -সহ সঊদী আরবের বহু প্রসিদ্ধ আলিম তার ছাত্র ছিলেন।

শানক্বীত্বী (রহঃ) ছিলেন অল্পে তুষ্ট জীবনের মূর্ত প্রতীক। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'আববা আমাদের নিয়ে মদীনায় থাকতেন। একবার তাঁর হাত খালি হয়ে যায়। তাঁর কাছে কোন টাকা ছিল না। একজন প্রতিবেশী এটা বুঝতে পেরে তাকে কিছু সম্পদ ঋণ দেওয়ার ওয়াদা করে। তিনি যখন সেই প্রতিবেশীর কাছে ঋণ নিতে গেলেন। দেখলেন, ঋণ দিতে আগ্রহী লোকটা অতি সাদামাটা পোশাক পরিধান করে গৃহস্থলী কাজ-কর্ম করছেন। আববা এটা দেখে ঋণ না নিয়েই বাসায় ফিরে আসলেন। তাকে দেখে মনে হ'ল- যেন তার কোন উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তিনি আমাদের কাছে সেই প্রতিবেশীর বিবরণ পেশ করে বলেন, 'আমি তাকে দেখে নিজের অজান্তেই রাস্তার ধূলা-বালির ওপরে সিজাদয় পড়ে গেলাম। সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সাথে সাথে আমার হৃদয়জুড়ে কি যে খুশি ও প্রশান্তির বাতাস দোলা দিয়ে গেল- তা আল্লাহ ছাড়া কেউ

জানে না। মনে মনে বললাম, আমি কিভাবে দুনিয়া কামনা করতে পারি, অথচ আমার রব আমাকে ইলমের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, তাঁর কিতাব অনুধাবন করার তাওফীক্ব দিয়ে আমাকে মর্যাদামন্ডিত করেছেন? তখন আমি অনুভব করলাম, আল্লাহ আমাকে কুরআনের মর্ম অনুধাবনের যে নে‘মত দান করেছেন, তা দিয়ে পুরো দুনিয়া পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে আর কারো কাছে কোন কিছু চাওয়ার আগেই মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা দিয়ে আমার হৃদয়ে অভাবের দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং আমাকে সম্মান ও মর্যাদার চাদরে আবৃত করে নিলেন। তাই আমি ঋণ না নিয়েই চলে আসলাম’।

শায়খের ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, আমার আববা দুনিয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন এবং আমাকে উপদেশ দিয়ে বলতেনঃ ‘দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান থাক! কেননা দুনিয়াটা লবণাক্ত পানির মতো। শয়তান তোমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বলবে, তুমি সম্পদ সঞ্চয় করো, যাতে সেই সঞ্চিত সম্পদ দিয়ে দান-ছাদাক্বাহ করতে পার, মাদ্রাসা নির্মাণ করতে পার এবং আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পার। সে তোমাকে আরো মিথ্যা অভয় দিবে এবং চাইবে, তুমি যেন (সম্পদ সংগ্রহে) তোমার সময় অপচয় করে ফেল। কিন্তু যখন তুমি সম্পদ সঞ্চয় করে ফেলবে, তখন তুমি আর মানুষের জন্য দান করতে চাইবে না এবং সেই ধন তোমাকে আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফেল করে ফেলবে। এভাবেই শয়তান তোমাকে কল্যাণকর বিষয় থেকে নিবৃত্ত রাখতে সচেষ্ট থাকে’ [৬৮]।

(৪) সমকালীন মনীষীদের মাঝে আরেকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হ’লেন আল্লামা মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মিন (রহঃ)। তার জীবনটা অল্পে তুষ্টির স্বচ্ছ সলিলে বিধৌত ছিল। তার জীবনী থেকে দু’টি উপদেশমূলক ঘটনা তুলে ধরা হলঃ

শায়খ উছায়মীন (রহঃ)-এর ছাত্র সুলাইমান বিন সালেম আল-হানাকী (রহঃ) বলেন, একদিন শায়খ উছায়মীন (রহঃ) মসজিদের বারান্দায় বসে তার ছাত্রদের সামনে দারস দিচ্ছিলেন। ছাত্ররা তাকে বিভিন্ন শারঈ মাসায়েলের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিল, আর তিনি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমতাবস্থায় একটি আলিশান গাড়ি মসজিদ চত্ত্বরে প্রবেশ করল। চালক গাড়ি থেকে নেমে শায়খের কাছে আসল এবং শহরের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলল, ‘তিনি এই গাড়িটি আপনাকে হাদিয়া দিয়েছেন’। এই কথা বলে সে শায়েখের কাছে গাড়ির চাবি দিতে হাত বাড়াল। কিন্তু তিনি চাবি নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু চালক পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তাই শেষ পর্যন্ত চাবিটা নিলেন।

লোকটা চলে গেলে তিনি চাবিটা পাশে রেখে আবার ছাত্রদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। কিন্তু চাবির দিকে একবারও তাকালেন না। এভাবে দরস চলতে থাকল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ এক যুবকের আগমন ঘটল। সে শায়খকে সালাম দিয়ে আরয করে বলল, 'শায়খ! আজ রাতে আমার বিবাহ সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ। আমি মনে প্রাণে কামনা করি যে, আপনি আমার বিবাহে উপস্থিত থাকবেন'। শায়খ ওযর পেশ করে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তার উপস্থিতির জন্য যুবকটি পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন শায়খ তার প্রতি কোমল হয়ে বললেন, 'আসলে পরিস্থিতি অনুকূলে হচ্ছে না। তাছাড়া আমি তোমার বিবাহে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতাম। তুমি এক কাজ কর, এই গাড়ির চাবিটা নাও! এটা আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উপহার দিলাম। যুবক চাবিটা হাতে নিল এবং গাড়ি নিয়ে চলে গেল। এরপর শায়খ আবার ছাত্রদের সামনে কথা বলা শুরু করলেন। তিনি আগের মতো একদম স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে থাকলেন। যেন কিছুই হয়নি [৬৯]।

সুলায়মান হানাকী (রহঃ) আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার সঊদী আরবের তৎকালীন বাদশাহ খালিদ এবং যুবরাজ ফাহাদ শায়খ উছায়মীন (রহঃ)-এর বাড়িতে তাকে দেখতে যান। ঘরের অনাড়ম্বর কাঠামো দেখে বাদশাহ তাকে একটি নতুন বাড়ি উপহার দেওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং তাকে একটি প্রাসাদ তৈরি করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। উত্তরে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বললেন, 'আমি আপনার প্রস্তাবের সমাদর করি, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন! তবে ইতিমধ্যেই আমি ছালিহিয়্যা (উনাইযা শহরের একটি এলাকা)-তে একটি বাড়ি নির্মাণ করছি'। বাদশাহ তার জন্য কিছু একটা করতে চাচ্ছিলেন, তখন শায়খ বললেন, 'যদি আপনি কিছু করতেই চান, তাহ'লে দয়া করে আমার ছাত্রদের বসবাসের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ করে দিন, অন্যথা তারা মসজিদে বসবাস করছে, আর এটি তাদের জন্য খুব কষ্টকর'। বাদশাহ চলে যাওয়ার পরে, ছাত্ররা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'শায়খ! আমরা তো জানতামই না যে আপনি ইতিমধ্যে ছালিহিয়্যাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করছেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'তোমরা কি জাননা, ছালিহিইয়াতে একটি কবরস্থান আছে?' তারা বলল, 'জ্বী'। তিনি বললেন, 'আমি সেখানেই আমার পরকালের বাড়ি নির্মাণ করছি' [৭০]।

দুনিয়া বিষয়ে সাহাবীদের অবস্থানঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীরা দুনিয়ার প্রতি কখনোই লোভী ছিলেন না। তারা ছিলেন রাসূল সা. এর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও তার শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রপথিক। তাই তারাও ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত দুনিয়া বিমুখ এবং আখিরাত অভিমুখী।

সাহাবীরা কখনো ভোগ-বিলাসের জীবন যাপন করেননি। তারাও সাদা সিদা জীবন-যাপন করতেন। তারা ছিলেন কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির আদর্শ। সাহাবীগণ সবসময় আখিরাতকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দিতেন। খলিফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক ভালো ভালো ও সু-স্বাদু খাওয়ার খাওয়া এবং পানীয় পান করা হতে বিরত থাকতেন এবং অভিজাত ও দামি খাওয়া ও পানীয় হতে নিজেকে দূরে রাখতেন। আর তিনি বলতেন, আমি আশংকা করি আমি যেন তাদের মত না হই, যাদের বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে বলেনঃ

"আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। তোমরা যেহেতু অন্যায়ভাবে জমিনে অহংকার করতে এবং তোমরা যেহেতু নাফরমানী করতে, সেহেতু তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে"। [সূরা আহকাফ, আয়াত: ২০] আবু মিজলায বলেন, কতক সম্প্রদায় এমন আছে, যারা দুনিয়ার অনেক কল্যাণ যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা তারা হারাবে, তখন তাদের বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ।

আখনফ ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারপর আমরা মদিনায় ফিরে এলাম এবং কুরাইশের লোকদের একটি মজলিশে উপস্থিত হলাম। তখন মোটা কাপড় পরিহিত, সুঠাম দেহের অধিকারী ও বিবর্ণ চেহারার একলোক এসে তাদের মধ্যে উপস্থিত হল। তারপর সে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা যারা ধন-সম্পদ একত্র করে- যাকাত আদায় করে না তাদের সু-সংবাদ দাও আগুনের তখতির; যাকে জাহান্নামের আগুনের উপর গরম করা হবে। অত:পর তা তাদের স্তনের বোটার উপর রাখা হলে তা তাদের দুই কাঁধের পার্শ্ব দিয়ে নির্গত হবে। আর তার দুই কাঁধের উপর রাখা হলে তা তার দুই স্তনের বোটা দিয়ে বের হয়ে আসবে। তার কথা শোনে সমবেত লোকেরা সবাই মাথা নিচু করে রাখল কেউ তার কথার কোন প্রকার জবাব দিল না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর লোকটি চলে গেলে আমি তার পিছু নিলাম এবং দেখতে পেলাম লোকটি একটি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসল। আমি তাকে বললাম, তুমি তাদের যা বললে তারা তা অপছন্দই করল। তিনি বললেন, ঐ সব লোকেরা কিছুই বুঝে না। আমার বন্ধু আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি কাউকে দেখতে পাচ্ছ? আমি তাকিয়ে দেখলাম সূর্য ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পেলাম না। আমি ধারণা করছিলাম তিনি হয়তো আমাকে কোথাও কোন কাজে পাঠাবেন। আমার নিকট যদি সূর্যের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকত, আর আমি তা তিনটি দিনার ছাড়া

সবই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর রাহে ব্যয় করাতে তেমন কোন আনন্দ অনুভব করি না। অর্থাৎ তিনটি দিনারও একত্র করা বা জমা রাখা তার নিকট অ-পছন্দনীয় ছিল। তারা আসলে কিছুই বুঝে না এ কারণে তারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ একত্র করতে ব্যস্ত। আমি তাকে বললাম, তোমার ও তোমার কুরাইশ ভাইদের কি হল, তাদের তুমি একত্র করছ না এবং তাদের থেকে তুমি আক্রান্ত হচ্ছ না। সে বলল, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট দুনিয়া রবিষয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন করব না এবং দ্বীনের বিষয়ে কোন কিছু জানতে চাইব না।

ওয়াবরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করল, আমি হজের ইহরাম বেঁধেছি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করব কি? তিনি বললেন, তাতে তোমাকে কে বাধা দেয়? তিনি বললেন, আমি অমুকের ছেলেকে দেখেছি, সে তা অপছন্দ করে আর তুমি আমার নিকট তার চেয়ে অধিক উত্তম, তাকে আমি দুনিয়ার ফিতনায় নিপতিত হতে দেখছি। তিনি বললেন, আমাদের বা তোমাদের মধ্যে কে আছে? যাকে দুনিয়ার ফেতনায় আক্রমণ করেনি। সাহাবীদের যুগেই মানুষকে দুনিয়ার মহব্বত আক্রান্ত করে ফেলেছে। তাহলে বর্তমান যুগে আমাদের অবস্থাতো আরও অনেক নাজুক। বর্তমানে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যাদের দুনিয়ার মহব্বত আক্রমণ করেনি। মানুষ দুনিয়ার উপার্জনের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। কিন্তু আখিরাত লাভের জন্য সামান্য সময়ও ব্যয় করতে রাজি হয় না।

আমর ইবন কাইস রহ. হতে বর্ণিত, এক লোক তার নিকট মুয়ায বিন যাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিস বর্ণনা করে বলেন, যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন সে বলল, হে মৃত্যু তোমাকে ধন্যবাদ! তুমি একজন দূরের মেহমান। তুমি আমার বন্ধু আমার অভাবের সময় তুমি এসেছ। হে মৃত্যু! আমি তোমাকে ভয় করতাম, কিন্তু আজ আমি তোমার হিতাকাংখি। হে মৃত্যু! তুমি জান আমার দুনিয়াকে মহব্বত ও দুনিয়াতে দীর্ঘদিন থাকাকে মহব্বত করা দুনিয়ার সৌন্দর্য, নদ-নদী ও গাছ-পালা ইত্যাদি অবলোকন করার জন্য নয়। আমি দুনিয়াতে থাকতে চাই তৃষ্ণার্তদের পিপাসা নিবারণ করতে, দু:সময়ের বন্ধু হতে ও আলেমগণের জিকিরের অনুষ্ঠানে ভিড় জমাতে [৭১]।

দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সাহাবির বিস্ময়কর মন্তব্যঃ

দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আমাদের অনেকের প্রান্তিকতা রয়েছে। কেউ আখিরাতের চিন্তা করে পৃথিবীর অবস্থানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পরিবার-পরিজনদের জীবিকার ব্যবস্থাকে অগুরুত্বপূর্ণ ভাবে। আবার কেউ আখিরাতের জীবনকে উপেক্ষা করে দুনিয়ার অবস্থানকেই মনে করে আসল। তাই দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের নানা

প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অথচ দুনিয়ার ব্যাপারে সঠিক অবস্থান কী হবে তা বিস্তারিত কোরআন-হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। দুনিয়ার ব্যাপারে বিশিষ্ট এক সাহাবির ন্যায়সংগত একটি মন্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো। তখন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.)-এর শাসন চলছিল। জাবের নামে এক ব্যক্তি সংকটে পড়ে এক রাতে মদিনায় পৌঁছেন। তিনি নিজেই বলেন, ‘সংকট সমাধানের জন্য সকাল সকাল আমি ওমর (রা.)-এর দরবারে গেলাম। আমি বাকপটুতা ও যুক্তি-তর্কে বেশ পারদর্শী ছিলাম। আলোচনার শুরুতেই আমি দুনিয়াকে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে উপস্থাপন করলাম। এক পর্যায়ে দুনিয়ার জীবনযাপনের সমালোচনা করে বিষয়টিকে এমন নিচু পর্যায়ে নিয়ে গেলাম যে তা আর কোনো কিছুর সমতুল্য রইল না। বৈঠকে ওমর (রা.)-এর পাশে শুভ্র আকৃতির এক ব্যক্তি বসা ছিলেন। আমার আলোচনা শেষে তিনি বলে উঠলেন, ‘দুনিয়ার ব্যাপারে তোমার সমালোচনা ছাড়া বাকি সব কথাবার্তাই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল। আচ্ছা, তুমি কি জানো দুনিয়া কী? মূলত দুনিয়া আখিরাতে পৌঁছার সহজ রাস্তা এবং এই দুনিয়া হচ্ছে আমাদের সেসব আমল ও কাজকর্মের ক্ষেত্র, যার প্রতিদান আমরা আখিরাতে পাব।’

এ কথা শোনার পর জাবের বলেন, এভাবে দুনিয়ার বাস্তবতা ও স্বরূপ সম্পর্কে এমন এক ব্যক্তি বলা শুরু করলেন, যিনি দুনিয়া সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিকতর ইলম ও জ্ঞান রাখেন। আমি ওমর (রা.)-এর কাছে এই ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, তিনি হলেন মুসলমানদের সরদার উবাই ইবনে কাব (রা.)। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৪৭৬) আর উবাই ইবনে কাব (রা.) সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ বলেছেন, হে উবাই, আল্লাহ তোমাকে ‘লাময়া কুনিল্লাজিনা কাফারু মিন আহলিল কিতাব।’ অর্থাৎ কিনা সুরা বাইয়িনাহ পড়ে শোনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। তখন উবাই ইবনে কাব (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কি আমার নাম বলেছেন? নবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি (আনন্দে) কেঁদে ফেললেন। (বুখারি, হাদিস : ৩৮০৯)

দুনিয়া বিষয়ে তাবেয়ীনদের অবস্থানঃ

আমরা মালেক ইবনে দীনার রহ. এর মুমূর্ষু অবস্থায় তার ঘরে প্রবেশ করি। তখন মৃত্যুর সঙ্গে তার পাঞ্জা লড়ছে। তিনি মাথা আসমানের দিকে ওঠালেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি জান আমি দুনিয়াতে বেঁচে থাকাকে মহব্বত করা আমার পেট বাচানো বা যৌবনের তাড়নায় নয়। একদিন আবু মুসলিম আল-খাওলানী রহ. মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, এক জামাত লোক একটি মজলিসে একত্র হয়ে বসে আছে। তাদের দেখে তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, লোকেরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকির বা অন্য কোন ভালো কাজে এখানে একত্র হয়েছে। তাই তিনি নিজেও গিয়ে তাদের সাথে বসলেন। মজলিসে গিয়ে দেখলেন, একজন বলছে

আমার গোলাম ফিরে এসেছে! তার এ সমস্যা। অপরজন বলছে আমার গোলামের মাল-সামান ও প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করছি ইত্যাদি। তিনি কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে লোক সকল! তোমরা কি জান আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত কিরূপ? শোন! এক লোক খুব ভারি মুষলধার বৃষ্টিতে আক্রান্ত হল, তখন সে আত্মরক্ষার জন্য এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখতে পেল, দুটি বিশাল প্রাচীর। লোকটি মনে মনে চিন্তা করল, যদি আমি এ প্রাচীরে গিয়ে আশ্রয় নিই, তাহলে হয়ত বৃষ্টি হতে রক্ষা পাব এবং বৃষ্টির বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে পারব। লোকটি দৌঁড়ে গিয়ে ঐ ঘরটিতে প্রবেশ করলে দেখতে পেল ঘরটির উপরে কোন ছাঁদ নাই। আমি তোমাদের নিকট বসলাম, আশা করছিলাম তোমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকির বা কোন কল্যাণ মুলক কাজে লিপ্ত আছ। কিন্তু না, দেখি তোমরা আসলে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করছ। এ কথা বলে লোকটি চলে গেল [আয-জুহুদ লি-ইবনুল মুবারক (৩৩৮)]।

দুনিয়ার মহব্বতের বহি:প্রকাশঃ

দুনিয়ার প্রতি অধিক মহব্বতের কারণে সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। মারা-মারি কাটা-কাটি ইত্যাদির মুল কারণ, হলো দুনিয়ার মহব্বত। বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাই ভাই ভাইয়ে সাথে, পিতা পুত্রের সাথে এবং পাড়া প্রতিবেশীর সাথে দুনিয়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে। অনেক সময় তা শুধু ঝগড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হত্যা জেল-জুলুম ইত্যাদিতে রূপ নেয়। মোটকথা দুনিয়ার মহব্বত হলো সব গুনাহ পাপাচার ও অপরাধের মূল। নিম্নে এ বিষয়ের কিছু প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হল। আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন।

১. মানুষকে দুনিয়ার মধ্যে ডুবে থাকতে বাধ্য করা:

দুনিয়ার মহব্বত মানুষকে গুনাহে লিপ্ত থাকতে বাধ্য করে। তারা দুনিয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে হালাল হারাম ন্যায় অন্যায় কোন কিছুকে তোয়াক্কা করে না। যেখানেই দুনিয়া লাভ দেখে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহ ইবন হারেস ইবন নওফল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেনঃ "মানুষ সব সময় দুনিয়ার অনুসন্ধানে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে"।

২. আখিরাতের নাম বিক্রি করে দুনিয়া অর্জন করা:

বর্তমান সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা দ্বীন দ্বারা দুনিয়া কামাই করে। দ্বীনকে দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময় বিক্রি করে দেয়। দ্বীনের নামে ইসলামের নামে বিভিন্ন ধরনের কুকর্ম বিদআত শিরক করে দুনিয়া উপার্জন করছে। তারা দুনিয়ার সামান্য লাভের জন্য দ্বীনকে নষ্ট

করছে। মুতাররফ রহ. বলেন: "দুনিয়ার প্রতি সর্বনিকৃষ্ট চাহিদা হল, আখিরাতের নাম বিক্রি করে দুনিয়া অর্জন করা। ফুজাইল ইবন আয়াজ রহ. বলেন, "দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জনের তুলনায় ঢোল তবলা বাজিয়ে দুনিয়া উপার্জন করা আমার নিকট বেশি প্রিয়"। জুনাইদ রহ. বলেন, "আমি ছুররি রহ. কে যারা দ্বীনের দ্বারা যে দুনিয়া কামাই করে তাদের দুর্নাম করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, "অপবিত্র কাজ হল, একজন বান্দা তার দ্বীন দ্বারা তার জীবিকা উপার্জন করা"। মালেক বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "মালিকের ওস্তাদ রবিয়া আর-রাঈ বলতেন, হে মালেক! হতভাগা কমবখত কে? উত্তরে তিনি বলেন, আমি বললাম, যে দ্বীন দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে। তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করল, কে তার চেয়ে আরও নিকৃষ্ট কমবখত? সে উত্তরে বলল, যে অন্যের দুনিয়াকে সুন্দর করে নিজের দ্বীনকে বাদ দিয়ে। সে বললেন, আমার উত্তর শুনে আমার উস্তাদ খুব খুশি হলেন এবং আমাকে সাবাস দিলেন"। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারককে জিজ্ঞাসা করা হলো, প্রকৃত মানুষ কে? উত্তরে সে বলল, আলেমগণ। তারপর জিজ্ঞাসা করা হল, বাদশাহ কারা? উত্তরে সে বলল, আবেদগণ। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কমবখত কারা? উত্তরে সে বলল, যারা দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া কামাই করে।

৩. খাওয়া-দাওয়া পোশাক-আশাক ইত্যাদিতে সীমাতিরিক্ত অপচয় করা:

মুয়াজ ইবন জাবাল হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামনের দিকে পাঠান, তখন তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বলেনঃ "তোমরা ভোগ-বিলাস ও অপচয় করা হতে সতর্ক থাক। কারণ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বান্দারা কখনোই ভোগ-বিলাস ও অপচয় করেন না"।

৪. ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও ক্ষমতার লোভ:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেন,

এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা যমীনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৩]। কা'ব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে কোন ছাগলের পালের মধ্যে ছেড়ে দেয়া, ছাগলের পালের জন্য ততটা ক্ষতিকর নয়, যতটা ক্ষতিকর হয় একজন মানুষের দ্বীনের জন্য, যখন তার মধ্যে ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও ক্ষমতার লোভ থাকে"।

দুনিয়ার মহব্বতের কারণসমূহঃ

সব কিছুর পেছনে কোন না কোন কারণ থাকে। কারণ, জানা থাকলে তা হাসিল করা কিংবা তা হতে বিরত থাকা সহজ হয়। দুনিয়ার মহব্বতের অনেকগুলো কারণ আছে। এগুলো যখন আমাদের জানা থাকবে তখন তা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকা সহজ হবে। দুনিয়ার মহব্বতের অনেক কারণ আছে। আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলোচনা করব।

১. দুনিয়ার সৌন্দর্য ও বাহ্যিক চাকচিক্য:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেনঃ 'সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম' [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৬]।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "অবশ্যই মনে রাখতে হবে, দুনিয়া খুব সুন্দর, উপভোগ্য, সজ্জিত ও আনন্দদায়ক। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের দুনিয়াতে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তিনি দেখেন তোমরা কেমন আমল কর। তোমরা দুনিয়া বিষয়ে সতর্ক থাক, আর নারীদের বিষয়ে সতর্ক থাক। কারণ, বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিতনা সংঘটিত হয় নারীদের নিয়ে"।

২. মানবাত্মা ও অন্তর দুনিয়ার দিকে অধিক ঝুঁকে পড়া:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেনঃ "মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালবাসা– নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪]।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেনঃ "বৃদ্ধ মানুষের অন্তর দুটি জিনিষের মহব্বতে যুবক। দুনিয়ার মহব্বত ও ধন-সম্পদের মহব্বত"। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, "আদম সন্তান বুড়ো হয়, তবে তার দুটি জিনিষ জোয়ান হতে থাকে। এক-ধন-সম্পদের লোভ, দুই- দুনিয়ার জীবনের লোভ"।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে আরও বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি আদম সন্তানের ধন-সম্পদের দুটি উপত্যকা থাকে, তখন সে আরও একটি উপত্যকা তালাশ করবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া কোন কিছু দ্বারাই পুরো করা যাবে না। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করবেন যাকে তিনি ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন"। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যদি আদম সন্তানের উপত্যকা থাকে, তখন সে আরও একটি স্বর্ণ-মুদ্রার উপত্যকা চাইবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া কোন কিছু দ্বারাই পুরো করা যাবে না। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করবেন যাকে তিনি ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন”।

৩. বর্তমানকে প্রাধান্য দেয়া প্রতীক্ষিত ভবিষ্যতের উপর:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

“বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী”। [সূরা আলা, আয়াত: ১৭]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, [বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের নিকট প্রেরণ করেন তার রাসূলগণ, নাযিল করেন কিতাবসমূহ। তাদের নিকট আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বার্তা পাঠান এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা করেন, কোন কাজে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি আর কোন কাজে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর অসন্তুষ্টি। মানুষ যদি তাদের প্রবৃত্তির পূজা ও মানবিক চাহিদা থেকে বের হয়ে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর হুকুমের আনুগত্য করে তবে আল্লাহ তাদের জান্নাতে চিরস্থায়ী নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি দেন। তারপরও অধিকাংশ জ্ঞানীদের জ্ঞান এ দুনিয়া খতম হওয়ার পর, নগদ, উপস্থিত ও চাক্ষুষের উপর প্রতীক্ষার পরবর্তী ভবিষ্যৎকে প্রাধান্য দিতে রাজি হয় না। তারা বলে নগদ পন্য যা আমার কব্জায় রয়েছে, তা কিভাবে সুদীর্ঘ কালের জন্য বাকী বিক্রি করবো? যা পৃথিবীর ধ্বংস ও দুনিয়ার নি:শেষ হওয়ার পর লাভ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ লোকের অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা বলে, তুমি এখন যা দেখছ, তা গ্রহণ কর, আর যা শুনছ তা ছাড়। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে তাওফিক দেয়, সেই আখিরাতের মূল্য বুঝতে পারে এবং ঈমানের শক্তি ও জ্ঞান দ্বারা আখিরাতের স্থায়িত্ব ও রহস্য সম্পর্কে জানতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যারা আনুগত্য করে তাদের জন্য যে সব নেয়ামত আর যারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নাফরমানি করে তাদের জন্য যেসব আযাব নির্ধারণ করেছেন তা তারা বুঝেন। তারা দুনিয়ার বাস্তবতা, পরিবর্তন, অল্প সময়ে নি:শেষ হওয়া, দুনিয়ার গাদ্দারী ও অত্যাচার, অনাচার সবই দেখতে পান। তারা জানেন, দুনিয়া হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমন বর্ণনা করেছেন, খেলাধুলা, ক্রীড়া, কৌতুক ও ধন-সম্পদ ও ছেলে সন্তান নিয়ে প্রতিযোগিতা। আর ধন-সম্পদ নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অহংকার। আর দুনিয়া হল, বৃষ্টির দ্বারা উৎপন্ন ফসলের মত যা একজন কৃষককে খুশি করে ও আনন্দ দেয়। অত:পর তুমি দেখতে পাবে, উৎপাদিত ফসলগুলো শুকিয়ে হলুদ বর্ণের হয়ে গেছে। অথচ এসব ফসল একটু আগেও তরতাজা ও সবুজ বর্ণের ছিল। তারপর এ ফসলগুলো খড়-কুটো ও ধুলায় পরিণত হয়। আমাদের ও ছেলে

সন্তানদের সৃষ্টি এ জগতেই। ফলে আমরা এ ছাড়া কিছুই বুঝি না এবং এর বাইরে কোন কিছু বুঝতে রাজি না। আমাদের অভ্যাস আমাদের বিচারক আর আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের বাদশাহ। আমাদের জ্ঞানের উপর ইন্দ্রসমূহ ক্ষমতাশীল ও রাজা। নফসের চাহিদা ও দাবি অনুযায়ী চলে আমাদের জীবন।

মোট কথা, দুনিয়ার মহব্বত ও দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়া দুই কারণে হয়ে থাকে।
প্রথম কারণ: দ্বীন ও ঈমান ধ্বংস হওয়া।
দ্বিতীয় কারণ: জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হওয়া।

দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতিঃ

দুনিয়ার প্রতি অধিক মহব্বত থাকার কারণে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। দুনিয়া মানুষের জন্য অনিবার্য ও জরুরি, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এ দুনিয়াই হবে একজন মানুষের শেষ প্রান্তর ও জীবনের সবকিছু। দুনিয়া হল একজন মানুষের জন্য আখিরাতের ক্ষেত ও সেতুবন্ধন স্বরূপ। একজন মানুষের শেষ প্রান্তর ও গন্তব্য হল, আখিরাতের জীবন ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি অর্জন। দুনিয়াতে তার যাবতীয় কাজ ও আমল হবে তার আসল গন্তব্য ও শেষ ঠিকানার জন্য। দুনিয়া তার আসল গন্তব্য বা শেষ ঠিকানা নয়। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের দুনিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হতে বা ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করেন এবং দুনিয়ার মোহে পড়ে আমরা যাতে ধোঁকায় না পড়ি এ জন্য তিনি আমাদের সতর্ক করেন। দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়াতে নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তা চাই নগদে হোক অথবা পরবর্তীতে হোক। নিম্নে কয়েকটি ক্ষতি ও পরিণতির কথা আলোচনা করা হল।

১. দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের চাবিকাঠি:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "দুনিয়াতে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির চাবি হল, আশাকে খাট করা বা অধিক আশা করা হতে বিরত থাকা। আর যাবতীয় সব কল্যাণের চাবি হল, আখিরাতের আকাঙ্ক্ষা করা ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর প্রতি বেশি বেশি ধাবিত হওয়া। আর সমস্ত অনিষ্টের চাবি হল, দুনিয়ার প্রতি অধিক মহব্বত ও লম্বা আশা। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে আমরা অনেকেই আছি এমন যারা কোন জিনিষে কল্যাণ আর কোন জিনিষে অকল্যাণ তা আমরা ভালোভাবে জানি না। অথচ এ বিষয়সমূহের ইলম হল অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ। কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি কি তা জানা অনেক বড় ইলম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তা জানা ও তার উপর আমল করার তাওফিক দেন না। আল্লাহ যাদের চান কেবল তাদের কল্যাণ দেন। আর যাদের তিনি চান না তাদের চেয়ে হতভাগা দুনিয়াতে আর কেউ হতে

পারে না। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালো ও খারাপ সব কিছুর জন্য চাবি ও দরজা নির্ধারণ করে রেখেছেন। একজন মানুষ তা দিয়ে তার নিকট প্রবেশ করেন।

২. দুনিয়ার মহব্বত মহান আল্লাহ'র সাথে কুফরী করা ও তার নাফরমানির কারণ:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "মানুষ ঈমানদার অবস্থায় সকাল উদযাপন করে, আর বিকালে সে কাফের আবার ঈমানের অবস্থায় বিকাল অতিবাহিত করে কিন্তু সকালে সে ঈমান হারা হয়ে যায়। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য সে তার দ্বীনকে বিক্রি করে দেয়"। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, "একজন কাফের সেও কুফরের ক্ষতি সম্পর্কে জানে, কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত তাকে কুফরের উপর উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেনঃ

"যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। এটা এ জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফির কওমকে হিদায়াত করেন না। এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণ সমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল। সন্দেহ নেই, তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত"[সূরা নাহাল, আয়াত: ১০৬ -১০৯]।

৩. আখিরাতের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তির সম্মুখীন হওয়া:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "দুনিয়ার মহব্বতকারী তার দুনিয়া দ্বারা সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক শাস্তি ভোগ করবে। সে তার জীবনের তিনটি স্তরে সর্বাধিক বেশি আযাবের সম্মুখীন হবে। দুনিয়াতে তার শাস্তি হল, ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্য চেষ্টা করা ও এর জন্য দুনিয়াদারদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা ইত্যাদির কষ্ট। আর আলমে বরযখেও সে অধিক কষ্ট পাবে। সেখানে সে দুনিয়া হারানোর কষ্টে ও বেদনা অনুভব করবে এবং আফসোস করতে থাকবে। যখন সে বুঝতে পারবে যে, তার মধ্যে ও তার সম্পদের মাঝে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটেছে আর কখনোই তার সাথে এবং তার সম্পদের সাথে দেখা হবে না এবং দুনিয়ার বিনিময়ে এখানে আর কোন বন্ধু সে পাবে না যা তার সমপর্যায়ের হবে, তখন তার কষ্টের আর অন্ত থাকবে না। আর লোকটি কবরের মধ্যেও অনেক আযাবের অধিকারী হবে। ধন-সম্পদ হারানো চিন্তা, আফসোস, পেরেশানি তার আত্মায় এমনভাবে আঘাত করতে থাকবে যেমনটি সাপ, বিচ্ছু ও পোকা-মাকড় তার দেহে আঘাত করতে থাকে"। তিনি আরও বলেন, "দুনিয়াদারকে কবরে শাস্তি

দেয়া হবে এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সাথে সাক্ষাতের দিন তথা কিয়ামতের দিনও অধিক শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেনঃ

"অতএব তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি, আল্লাহ এর দ্বারা কেবল তাদের আযাব দিতে চান দুনিয়ার জীবনে এবং তাদের জান বের হবে কাফির অবস্থায়"। [সূরা তাওবা, আয়াত: ৫৫]

কোন কোন মনীষী বলেন, "তাদের ধন-সম্পদ একত্র করার কারণে শাস্তি দেয়া হবে। আর তাদের অবস্থা এমন হবে ধন-সম্পদের মহব্বতে তাদের জান যাওয়ার উপক্রম হবে। শুধুমাত্র সম্পদের মহব্বতে দুনিয়াতে তারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর হক আদায়ে অস্বীকার করেছিল"।

৪. অন্তর আখিরাতের প্রতি অমনোযোগী হওয়া ও নেক আমলে ত্রুটি করা:

দুনিয়াদারদের অন্তর আখিরাত বিমুখ হয়ে থাকে। ফলে তারা কোন নেক আমল করতে চায় না, তারা সবসময় তাদের লক্ষ্য দুনিয়া কামাই করাতে ব্যস্ত থাকে। তাদের সব ধরনের চেষ্টা, কষ্ট-ক্লেশ ও পরিশ্রম দুনিয়া কামাইর জন্যই ব্যয় হয়ে থাকে। ফলে তারা আখিরাত হতে বঞ্চিত হয়। আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভ করতে বেশি পছন্দ করে, সে তার আখিরাত লাভ করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে অর্জন করতে মহব্বত করে, তাকে অবশ্যই দুনিয়া অর্জন করতে লোকসান দিতে হবে। সুতরাং, তোমরা যা চিরস্থায়ী তার অর্জনকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর অর্জনের উপর প্রাধান্য দাও"।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বাণী- "মিথ্যাচারীরা ধ্বংস হোক! যারা সন্দেহ–সংশয়ে নিপতিত, উদাসীন"। [সুরা যারিয়াত, আয়াত: ১০, ১১] সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ, তারা আখিরাতের বিষয়ে অমনোযোগী, দুনিয়ার মহব্বতে তারা ডুবে আছে। অর্থাৎ তাদের অন্তর দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-সম্পদের মহব্বতে আখিরাত হতে ও তাদের যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা হতে সম্পূর্ণ বেখবর। তাদের অবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর এ আয়াতেরই নামান্তর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেনঃ "আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে" [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৮]।

আয়াতে الغمرةউল্লেখ করা হয়েছে। আর এটি সাধারণত প্রবৃত্তির পূজা করার কারণেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর আয়াতে السهوশব্দের অর্থও একই ধরনের। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে- السهو হল, কোন বস্তু হতে গাফেল হওয়া ও তার থেকে মনোযোগ ছুটে যাওয়া। আর সমস্ত

অনিষ্টের কেন্দ্র বিন্দু হল, গাফলত ও কু-প্রবৃত্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও আখিরাত হতে গাফেল হওয়ার ফলে কল্যাণের সমস্ত দরজা- মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকির ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জন্য জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগী করা- বন্ধ হয়ে যায়। আর কু-প্রবৃত্তি সমস্ত অনিষ্ট, গাফলত ও আতঙ্কের দরজা খুলে দেয়। ফলে মানবাত্মা কুপ্রবৃত্তির মধ্যে ডুবে থাকে এবং আল্লাহ হতে সম্পূর্ণ অমনোযোগী থাকে। অন্তরে গাইরুল্লাহ স্থান করে নেয়ার ফলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকির ভুলে থাকে। গাইরুল্লাহকে নিয়ে ব্যস্ত হয়, অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত বিশাল আকার ধারণ করে। যেমন, সহীহ বুখারি ও হাদিসের আরও অন্যান্য কিতাবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "অর্থের গোলাম ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সম্পদের গোলাম, ধ্বংস হোক পোশাকের গোলাম, ধ্বংস হোক জামা-কাপড়ের গোলাম। ধ্বংস হোক, ধ্বংসেই নিমজ্জিত থাকুক সে। যখন দুনিয়ার মুসিবতে পতিত হয়, তা যেন হটানো না হয়। তাকে যখন দুনিয়া দেয়া হয় তখন সে খুশি হয়, আর যখন তাকে দুনিয় দেয়া হয় না তখন সে অসন্তুষ্ট হয়"।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "দুনিয়ার মহব্বত বান্দা ও তার আখিরাতের উপকারী কর্মের মাঝে প্রাচীর তৈরি করে। কারণ, তার সামনে যখন দুনিয়া পেশ করা হয় তখন সে আখিরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়াকে সে অধিক মহব্বত করে তা নিয়েই ব্যস্ত হয়। মানুষ এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, কতক লোক আছে যাদের দুনিয়ার মহব্বত ঈমান ও শরীয়ত থেকে বিরত রাখে। কতক আছে যাদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি লাভ ও তার মাখলুকের খেদমতের জন্য যা পালন করা ওয়াজিব, তা পালন করা হতে তাদের বিরত রাখে। ফলে সে তার ওপর যে সব ওয়াজিব রয়েছে সে গুলো না বাহ্যিকভাবে পালন করে, না গোপনে পালন করে। আবার কতক আছে যাদের দুনিয়ার মহব্বত অসংখ্য করনীয় কাজ হতে বিরত রাখে। কতক আছে তাদের দুনিয়ার মহব্বত শুধুমাত্র দুনিয়া লাভের প্রতিবন্ধক হয় এমন ওয়াজিব থেকে বিরত রাখে অন্যগুলো সে ঠিকই পালন করে। আবার কতক লোক এমন আছে তারা যে সময় ওয়াজিবটি আদায় করা দরকার তখন আদায় করা হতে বিরত থাকে। ফলে সে সময়মত আদায় করতে অলসতা করে এবং যথাযথ পালন করে না। আবার কতক আছে কোন ওয়াজিব আদায় করতে গিয়ে অন্তর দিয়ে এবং কেবল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জন্য তা আদায় করে না। ফলে সে লোক দেখানোর জন্য করে থাকে অন্তর থেকে আদায় করে না। দুনিয়ার মহব্বতের সর্বনিম্ন স্তর হল, তা একজন বান্দাকে সৌভাগ্য লাভ হতে বিরত রাখে। আর তা হল, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মহব্বতে অন্তর ব্যস্ত হওয়া, জবান মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর স্মরণে তরতাজা থাকা, তার অন্তর তার জবানের উপর একত্র হওয়া এবং তার জবান ও অন্তর তার

প্রভুর উপর একত্র হওয়া। সুতরাং, বলাবাহুল্য দুনিয়ার মহব্বত ও তার প্রতি ভালোবাসা আখিরাতের ক্ষতি করে, যেমন আখিরাতের মহব্বত দুনিয়ার উপার্জনের ক্ষতি করে। হাদিস শরিফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফু সনদে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভ করতে বেশি পছন্দ করে, সে তার আখিরাত লাভ করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে অর্জন করতে মহব্বত করে, তাকে অবশ্যই দুনিয়া অর্জন করতে লোকসান দিতে হবে। সুতরাং, তোমরা যা চিরস্থায়ী তার অর্জনকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর অর্জনের উপর প্রাধান্য দাও"।

৫. অন্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বত সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হয় ও বিঘ্ন ঘটায়।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, "যখন অনেক বড় বড় ও শক্তিশালী উপাস্য- দিরহাম, দিনার, কুপ্রবৃত্তি ও নফস-যেগুলো অন্তরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মহ্ববত ও তার ইবাদত থেকে বিরত রাখে তা অন্তরের উপর কর্তৃত্ব করে, তখন সে অন্তরে কিভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মহব্বত থাকতে পারে। কারণ, এ সবের মহব্বত অন্তরে থাকার দ্বারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মহব্বত তার প্রতিবন্ধক হয়। আর কারো অন্তর যদি দুনিয়ার মহব্বতে ভর্তি হয়ে থাকে তা মাখলুকের সাথে আল্লাহকে শরীক করারই নামান্তর। যে অন্তর তার রবের পরিপূর্ণ মহব্বত ও ইবাদত করে, সে অন্তরে আর কারো প্রতি মহব্বত থাকতে পারে না। অন্তর গাইরুল্লাহর মহব্বতকে কিভাবে প্রতিহত করবে ও দূরে সরাবে; কারণ, প্রতিটি প্রেমিক তার প্রেমিকার অন্তরকে তার নিজের দিকেই আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তার দিকে টানতে থাকে এবং সে তার প্রেমিকাকে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে মহব্বত করা হতে বিরত রাখে"।

৬. মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকীরে অন্তর স্বাদ-আস্বাদন না করা:

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, "অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকিরের জন্য। এ কারণেই সিরিয়ার পূর্বসূরি জ্ঞানীদের থেকে একজন জ্ঞানী- আমার জানা মতে তার নাম সুলাইমান আল খাওয়ায রহ.- তিনি বলেন, জিকির অন্তরের জন্য দেহের জন্য খাদ্যের মত। দেহ যখন অসুস্থ হয়, তখন সে যেমন খাওয়ারের মজা পায় না অনুরূপভাবে যে অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকে সে অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকিরের মজা পায় না"।

আবি ইমরান আল মিসরী বলেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দাউদ আ. এর নিকট ওহী প্রেরণ করে বলেন, হে দাউদ তুমি আমার ও তোমারা মাঝে এমন কোন আলেমকে নির্বাচন করো না যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত জায়গা করে আছে। যেসব আলেমদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত

গেঁথে আছে তারা আমার বান্দার জন্য পথের কাটা। আমি তাদের সর্বনিকৃষ্ট যে শাস্তি দেব, তা হল, তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমার সাথে মুনাজাতের স্বাদ চিনিয়ে নেব"।

৭. সর্বদা দুশ্চিন্তা অভাব অনটন ও মতবিরোধ:

যারা দুনিয়াকে অধিক মহব্বত করে তাদের মধ্যে সর্বদা দুশ্চিন্তা ও হতাশা বিরাজ করে। তারা কোন কিছুতে শান্তি পায় না। সব সময় তাদের মন মগজ দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর থাকে। তারা ঠিক মত খেতে পারে না ঘুমাইতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার উপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। আর দরিদ্রতা ও অভাব তার চোখের সামনে তুলে ধরেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ভাগ্যে যতটুকু দুনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন তার বাহিরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দেন। তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সম্পদকে সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার নিকট অপমান অপদস্থ হয়ে আসতে থাকে"।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় তার যাবতীয় চিন্তা দুনিয়া অর্জন করা অথবা তার বড় চিন্তা হল দুনিয়া উপার্জন করা, তার অবস্থা উল্লেখিত হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী হবে। তার পরিণতিও এমন হবে যেমনটি রাসূল সা. বর্ণনা করেন। তিরমিযি ও অন্যান্য হাদিসের কিতাবে আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দেন। তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সম্পদকে সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার নিকট অপমান অপদস্থ হয়ে আসতে থাকে। আর যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দরিদ্রতা ও অভাব তার চোকের সামনে তুলে ধরেন এবং তার উপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামী তার ভাগ্যে যতটুকু দুনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাহিরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না"। দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় আযাব হল, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও অভাব অনটনের নিত্য সঙ্গী হওয়া। যদি দুনিয়া পিপাসুদের মাথায় পাগলামি না থাকত এবং দুনিয়ার মহব্বতে মাতাল না হত, তাহলে তারা এ আযাব হতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দরবারে পরিত্রাণ চাইত।

৮. দুনিয়ার মহব্বত মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকির হতে বিরত রাখে:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "দুনিয়ার মহব্বত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকির ও তার ভালোবাসা হতে মানুষকে বিরত রাখে। আর যার ধন-সম্পদ তাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকির হতে বিরত রাখে, সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। মানবাত্মা যখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর জিকির হতে গাফেল হয়, তখন শয়তান তাতে স্থান করে নেয় এবং সে যেদিক ইচ্ছা করে তাকে সেদিক নিয়ে যায়"।

আল্লামা ইবনুল জাওজী রহ. বলেন, "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি দুনিয়া প্রত্যেক তৃষ্ণার্তের জন্য নিরেট পরিচ্ছন্ন হয়, প্রতিটি অনুসন্ধানকারীর জন্য সহজলভ্য এবং দুনিয়া আমাদের জন্য স্থায়ী হয়; কোন ছিনতাইকারী চিনিয়ে না নেয়, তাহলেও দুনিয়া থেকে বিমুখ হওয়া ফরয ও ওয়াজিব। কারণ, দুনিয়া মানুষকে আল্লাহ হতে বিরত রাখে এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়। আর যে নেয়ামত নেয়া-মতদাতা হতে বিরত রাখে তাকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অন্যথায় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে"।

৯. একজন দুনিয়াদারের জন্য দুনিয়াই হল, তার শেষ গন্তব্য:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "যখন কোন বান্দা দুনিয়াকে মহব্বত করে, তখন দুনিয়াই তার লক্ষ্য হয়ে থাকে; সে দুনিয়া ছাড়া আর কোন কিছুই বুঝতে রাজি হয় না। তার কাছে আর কোন কিছুই ভালো লাগে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব আমলকে আখিরাত লাভ ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য নির্ধারণ করছে, সেসব আমলগুলোকে সে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে বিষয়টি পাল্টে যায় আর অর্ন্তনিহিত হিকমত উলটপালট হয়ে যায়। মোট কথা, এখানে দুটি বিষয় আছে, এক- মাধ্যমকে লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া, দুই- আখিরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করা। আর এ হল সর্বনিকৃষ্ট উলটপালট এবং মানবাত্মার জন্য সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক পরিণতি। এ ধরনের লোকের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বাণী হুবহু প্রযোজ্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল" [সূরা হুদ, আয়াত: ১৫, ১৬]। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেনঃ "যে আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখিরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না" [সূরা শূরা, আয়াত: ২০]। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেনঃ "যে দুনিয়া চায় আমি সেখানে তাকে

দ্রুত দিয়ে দেই, যা আমি চাই, যার জন্য চাই। তারপর তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত, বিতাড়িত অবস্থায়। আর যে আখিরাত চায় এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে মুমিন অবস্থায়, তাদের চেষ্টা হবে পুরস্কারযোগ্য"। [সূরা আল ইসরা, আয়াত: ১৮, ১৯] এখানে তিনটি আয়াত আছে একটি আয়াত অপর আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য এবং আয়াত তিনটির অর্থ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কল্যাণকে বাদ দিয়ে, দুনিয়া ও দুনিয়া সৌন্দর্য কামনা করে, তার ভাগে তাই মিলবে সে যা চায়; সে আর কোন কিছু পাবে না। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো আয়াতের ব্যাখ্যা করে এবং আয়াতের অর্থকে সমর্থন করে"।

১০. বান্দার আমল নষ্ট হয় এবং সাওয়াব ও বিনিময় হতে বঞ্চিত হয়:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ! দুনিয়াদারের পরিণতি কতই খারাপ এবং সে কত বড় বড় ছাওয়াব ও বিনিময় হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে। একজন মুজাহিদ যখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর রাস্তায় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলে লক্ষ্যে জিহাদ করে শহীদ হয়, তখন সে আর কোন সাওয়াব বা বিনিময় পায় না, তার আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং সে সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১১. হঠকারিতা:

দুনিয়ার মহব্বতের কারণে একজন মানুষের মধ্যে হঠকারীতা সৃষ্টি হয়। ফলে সে আর কাউকে মানতে চায়না এমনকি আল্লাহর আদেশ নিষেধও তার নিকট গুরুত্বহীন হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেনঃ কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ। [সূরা আলাক, আয়াত: ৬-৭] আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, "ইবনে আবী হাতেম রহ. বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেন যায়েদ ইবনে ইসমাইল তিনি বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেন, জাফর ইবনে আওন... আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ "দুই লোভী ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করে না। এক হল, জ্ঞানী-লোক দ্বিতীয় হল, দুনিয়াদার। তারা উভয় কখনো সমান হয় না। জ্ঞানী লোক তার জ্ঞানের কারণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। আর দুনিয়াদার তার দুনিয়ার কারণে হৎকারীতা ও সীমালঙ্ঘন বৃদ্ধি পায়।" তারপর আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ"। আয়াত তিলাওয়াত করেন, কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ। [সূরা আলাক, আয়াত: ৬-৭] আর অপর লোকের বিষয়ে বলেন, এ হাদিসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হতে মারফু সনদে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "দুই লোভী তাদের লোভ কখনোই শেষ হয় না। এক- ইলম পিপাসী, দুই- দুনিয়া লোভী"।

দুনিয়ার মহব্বতের চিকিৎসাঃ

দুনিয়ার মহব্বত মানবাত্মার জন্য একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি । এ ব্যাধির চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী। আর মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা আছে। চিকিৎসা ছাড়া কোন রোগ নেই। চাই দৈহিক রোগ হোক অথবা আত্মার রোগ। দৈহিক রোগের চেয়ে আত্মার রোগ মানুষের জন্য আরও অধিক ক্ষতিকর ও মারাত্মক। মানুষ দুনিয়াতে দৈহিক রোগকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, আত্মার রোগকে সেভাবে গুরুত্ব দেয় না। যার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয়। মানবাত্মার ব্যাধি একজন মানুষের জীবনকে বিষণ্ণ করে তুলে। সুতরাং, মানবাত্মায় যে সব সংক্রামক ও ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তার চিকিৎসা কি তা জানা ও তদনুযায়ী চিকিৎসা করা ফরয। দুনিয়া মহব্বত এটি মানবাত্মার একটি ক্ষতিকর ও মারাত্মক ব্যাধি। অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাধিতে আক্রান্ত ও জর্জরিত। এ ব্যাধির চিকিৎসা কি তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. দুনিয়ার হাকিকত ও বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর ইলম থাকতে হবে।

২. দুনিয়াকে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ বলে জানা:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেনঃ "ইসহাক ইবনে হানী রহ. তার মাসায়েল সমূহের আলোচনায় বলেন: "একদিন আবু আব্দুল্লাহ রহ. হাসান রহ. এর কথা নকল করে বলেন, একদিন আমি তার ঘর থেকে বের হই: তখন হাসান রহ. বলেন, তোমরা দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে কর। আল্লাহর শপথ করে বলছি! তুমি দুনিয়াকে একবারেই তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট পাবে, যখন তুমি তাকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বলে জানবে। হাসান রহ. আরও বলেন, আমি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে থাকলাম নাকি পূর্ব প্রান্তে তাতে আমি কোন পরওয়া করি না। আমাকে আবু আব্দুল্লাহ রহ. বলেছেন, হে ইসহাক! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নিকট দুনিয়া কতনা নিকৃষ্ট!

৩. দুনিয়া খুব দ্রুত ধ্বংস আর আখিরাত অতি নিকটে এ বিষয়ে চিন্তা করা:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "যে দুনিয়া প্রেমিক ও দুনিয়ার মহব্বত-কারী দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, সে দুনিয়াতে সবচেয়ে নির্বোধ, বোকা ও জ্ঞানহীন। কারণ, সে বাস্তবতার উপর নিছক ধারণাকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর নিদ্রাকে প্রাধান্য দিয়েছে জাগ্রত থাকার উপর। দুনিয়াতে সে ক্ষণস্থায়ী ছায়া যা একটু পর থাকবে না, তাকে বেঁচে নিয়েছে, চিরস্থায়ী

নিয়ামত যার কোন শেষ বা পরিণতি নাই তার বিপরীতে। আর সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে স্থায়ী জীবনের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছে। চিরস্থায়ী হায়াত, উন্নত জীবন ব্যবস্থাকে ক্ষণস্থায়ী, পথনিন্দ্রা ও স্বপ্নের বিনিময় বিক্রি করে দিয়েছে। কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক এ কাজ করতে পারে না এবং এ ধরনের ধোঁকায় পড়তে পারে না। তাদের দৃষ্টান্ত হল, একজন লোক অপরিচিত লোক কোন সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট আসল, তখন তারা তার সামনে খাওয়া, দাওয়া পেশ করলে, সে খেয়ে একটি তাঁবুর ছায়াতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর তারা যখন তাঁবুটি খুলে ফেলল, তখন লোকটি আক্রান্ত হলে ঘুম থেকে উঠে বলল, "যদি কোন মানুষের নিকট তার বড় চাওয়া পাওয়া দুনিয়াই হয়ে থাকে। তাহলে মনে রাখতে হবে সে অবশ্যই একটি ধোঁকার রশিকে মজবুত করে ধরে আছে। এ ছাড়া আর কিছুই না"। এ কবিতার মতই আরও একটি কবিতা কোন এক মনীষী বলেছিলেন, "হে দুনিয়ার মজা উপভোগকারী! মনে রেখো! দুনিয়ার কোন স্থায়িত্ব নেই এবং দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। এ তো শুধু সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ছায়া, যদ্বারা আহমকরা ধোঁকায় পতিত হয়"। ইউনুস ইবনে আব্দুল আলা রহ. বলেন, "দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল, ঐ লোকের মত যে ঘুমল এবং ঘুমের মধ্যে কিছু খারাপ স্বপ্ন দেখল, আবার কিছু ভালো স্বপনও দেখল। স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে ঘুম থেকে উঠে গেল। তখন সে দেখতে পেল আরে আমিতো আমার বিছানায় শুয়ে আছি! আর এতক্ষণ আমি কত জায়গায় না ঘুরে বেড়াচ্ছি। অর্থাৎ, দুনিয়া কেবলই স্বপ্ন, এছাড়া অন্য কিছু নয়"। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেন অর্থাৎ, এ তো হল, দুনিয়ার জীবনের সাময়িক সৌন্দর্য ও ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নিকট রয়েছে, তোমাদের উত্তম প্রত্যাবর্তন ও বিনিময়"।

৪. অল্পে তুষ্টি:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করেনঃ "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে"। [সূরা তাকাসুর, আয়াত: ১] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দেন। তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সম্পদকে সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার নিকট অপমান অপদস্থ হয়ে আসতে থাকে। আর যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দরিদ্রতা ও অভাব তার চোখের সামনে তুলে ধরেন এবং তার উপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ভাগ্যে যতটুকু দুনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাহিরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না"।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, হাসান রহ. আরও বলেন, "হে আদম সন্তান! তুমি তোমার অন্তরকে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করো না। যদি তাই কর, তবে তুমি খুব খারাপ বস্তুর সাথে তোমার অন্তরকে সম্পৃক্ত করলে। তুমি তার সাথে সম্পর্কের রশি কেটে দাও, দরজাসমূহ বন্ধ করে দাও। হে আদম সন্তান! তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু তোমাকে তোমার আসল গন্তব্যে পৌঁছাবে"।

৫. দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা:

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, "দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে মানুষের পেটে খাওয়ারের ক্ষুধার মত। বান্দা যখন মৃত্যু বরণ করে তখন সে অবশ্যই তার অন্তরে মহব্বতের পরিণতি দুর্গন্ধ ও খারাবী দেখতে পাবে। মানুষের খাওয়ার যখন হজম হয়ে যায়, তখন তা ঘৃণিত, পচা ও দুর্গন্ধ হয়ে মলদ্বার দিয়ে বের হয়। অনুরূপভাবে দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি। মানুষ যখন মারা যাবে তখন সে দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি কি তা চাক্ষুষ দেখতে পাবে। দুনিয়ার মহব্বতের দুর্গন্ধ সে অনুভব করবে। দুনিয়াতে খাদ্য যত উন্নত ও মজাদার হয় তার দুর্গন্ধ তত বেশি হয়। মানুষের নিকট প্রবৃত্তির চাহিদা যত বেশি আনন্দ দায়ক বা মজাদার হয়, তার মৃত্যু যন্ত্রণাও হবে বেশি কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক। মানুষ যখন কাউকে অধিক ভালবাসে, তখন তাকে হারালে সে অধিক কষ্ট পায়; তার মহব্বত অনুযায়ী সে কষ্ট পেতে থাকবে। ভালোবাসা বেশি হলে কষ্ট বেশি আর ভালোবাসা কম হলে কষ্ট কম।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহহাক ইবনে সুফিয়ানকে বলেনঃ "হে যাহহাক তোমার খাদ্য কি? উত্তরে সে বলল, গোস্ত ও দুধ। রাসূল বললেন, খাওয়ার পর এগুলো কি হয়? তখন সে বলল, যা আপনি জানেন। তখন রাসূল বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম সন্তানের পেটের থেকে যা বাহির হয় তাকে দুনিয়ার উপমা হিসেবে বর্ণনা করেছেন"। অনেক মনিষী তার সাথীদের বলতেন, চল আমার সাথে, আমি তোমাদের দুনিয়া দেখাবো। তারপর তাদের তিনি পায়খানায় নিয়ে যেতেন আর বলতেন, দেখ তোমরা তোমাদের ফলফলাদি, গোস্ত, মাছ ও পোলাও কোরমার পরিণতি"।

৬. সত্যিকার মজার কারণ লাভের জন্য ব্যস্ত না হওয়াঃ

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, "দুনিয়াতে সবচেয়ে মজা ও উপভোগ্য বস্তু হল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মারেফাত লাভ ও তার মহব্বতের মজা; এর চেয়ে অধিক মজা বা স্বাদ আর কোন কিছুতে হতে পারে না। কারণ, এটাই হল দুনিয়ার আসল মজা ও সর্বোচ্চ নেয়ামত। এ ছাড়া দুনিয়াতে আর যে সব ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক উপভোগ্য রয়েছে, তা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত;

যার কোন স্থায়িত্ব নেই। মানবাত্মা, দেহ ও অন্তরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভালোবাসা ও তার মহব্বতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই দুনিয়াতে সব চেয়ে উত্তম জিনিষ হল, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মহব্বত ও তার মারেফাত হাসিল করা। আর জান্নাতে সবচেয়ে উপভোগ্য ও মজাদার বস্তু হল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দিদার ও তার সাথে সাক্ষাত ও তাকে স্বচক্ষে দেখা। সুতরাং, বলা যায় যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মহব্বত ও তার মারেফাত লাভ করা চক্ষুর শীতলতা আত্মার প্রশান্তি ও অন্তরের তৃপ্তিদায়ক। আর দুনিয়ার নেয়ামত ও আনন্দ হল, ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক।আজকে যারা আনন্দ উপভোগ করছে বা শান্তিতে আছে আগামী দিন তারা এ শান্তিতে থাকতে পারবে না; তার শান্তি অশান্তিতে পরিণত হবে এবং তার খুশি দু:খে পরিণত হবে। অবশেষে লোকটি এক অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কালাতিপাত করবে। সুতরাং, মনে রাখতে হবে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে কখনোই হায়াতে তাইয়েবার চিন্তা করা যায় না। অনেক আল্লাহ প্রেমিক সময় সময় বলতেন, আমরা যে শান্তিতে আছি জান্নাতিরা যদি এ ধরনের শান্তিতে থাকে তাহলে অবশ্যই বলতে হবে তারা কতনা শান্তিতে আছে। অপর এক আল্লাহ প্রেমিক বলেন, আমরা যে শান্তিতে আছি, তা যদি রাজা-বাদশাহ ও তাদের সন্তানেরা জানত, তাহলে আমাদের এ শান্তি কেড়ে নেয়ার জন্য তারা আমাদের সাথে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করত।

৭. মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টিকে যাবতীয় সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়াঃ

আল্লামা ইবনে রজব রহ. বলেন, "পূর্বেকার কোন কোন মনীষীদের কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মহব্বত করে, তার নিকট মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মহব্বতের চেয়ে প্রিয় আর কোন কিছু হতেই পারে না; সে সব সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মহব্বতকে প্রাধান্য দেবে, অন্য কিছুকে সে প্রাধান্য দেবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করে, তাহলে তার নিকট দুনিয়া ছাড়া আর কোন কিছু প্রাধান্য পাবে না। ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্বীয় সনদে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি কোন বস্তুকে আমার চক্ষু দ্বারা দেখিনি, কোন কথা আমর জবান দ্বারা উচ্চারণ করিনি, কোন বস্তুকে আমার হাত দ্বারা স্পর্শ করিনি এবং পা দ্বারা পদপিষ্ট করিনি যতক্ষণ না, আমি চিন্তা করে দেখি যে এতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি নাকি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নাফরমানি। যদি দেখতাম এতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি রয়েছে, তখন আমি তা অতি তাড়াতাড়ি স্বআগ্রহে পালন করতাম আর যদি দেখতাম না এতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নাফরমানি রয়েছে, তাহলে তা হতে আমি বিরত থাকতাম।

৮. জান্নাতের নিয়ামতসমূহে ফিকির করা:

আল্লামা ইবনে রজব রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ আখিরাতের জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নাই। আখিরাতের জীবনই একমাত্র জীবন"।এর কারণ, হল, আদম সন্তানকে রুহ ও দেহের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর রুহ ও দেহ উভয়টি বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য-বস্তু ও যা দ্বারা তার শক্তি সঞ্চার হয় তার প্রতি রুহ ও দেহ উভয় মুখাপেক্ষী। এর এটাই হল তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় এবং এটাই হল একমাত্র জীবন। খাদ্য, পানীয়, বিবাহ লেবাস, পোশাক ইত্যাদি আরো যে সব জীবেনাপকরণ আছে তা নিয়ে হল দেহের জীবন। এ গুলো ছাড়া দেহ টিকে থাকতে পারে না। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই মানুষের সাথে জীব-জন্তুর একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আর মানবাত্মা হল, একেবারেই সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক; যার তুলনা হল ফেরেশতা। তার বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য-পানীয়ের প্রয়োজন হয় না। তার শক্তি, আরাম, আয়েশ, আনন্দ, খুশি সব কিছুই হল, তার স্রষ্টা, প্রতিপালক ও তার প্রভুকে চেনা, তার সাক্ষাত লাভের আকাঙ্ক্ষা, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং যে সব ইবাদত বন্দেগী, জিকির-আজকার ও মহব্বত করলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নৈকট্য লাভ করা যায় তা পালন করা। আর এটাই হল, মানবাত্মার জীবন। আর যখন মানবাত্মার এ সব খোরাক না থাকে দেহ যেমন খাদ্যের অভাবে হালাক হয়, অনুরূপভাবে মানবাত্মাও অসুস্থ ও ধ্বংস হয়। বরং মানব আত্মার পরিণতি আরও করুন হয়ে থাকে। এ কারণেই দেখা যায় অনেক ধনী ও সম্পদশালী সে তার দেহের চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করা সত্ত্বেও সে তার অন্তরে ব্যথা ও ভয়ভীতি অনুভব করকে থাকে। দুনিয়ার নারী বাড়ী গাড়ী সব কিছু থাকা সত্ত্বে সে অস্থির। তখন অনভিজ্ঞ লোকেরা মনে করে লোকটিকে খাদ্য-পানীয় বাড়িয়ে দিতে হবে, তাহলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ ধারণা করে তার মাতলামি দুর হলে, তার ব্যথা ও যন্ত্রণা দুর হয়ে যাবে। কিন্তু না! এগুলো সবই তার ব্যথা ও ভীতিকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কারণ, তার ব্যথা ও ভীতির আসল কারণ হল, তার আত্মার শক্তির অভাব ও তার আত্মার খাদ্যাভাব। সে তার আত্মার চাহিদার যোগান দিতে পারছে না; ফলে সে ব্যথা অনুভব করছে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

৯. দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতের জীবনের বিশ্বাসঃ

বিশ্বাস করতে হবে যে দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতের জীবনের মাঝে একত্র করা একটি কঠিন কাজ। সুতরাং, কেবল আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লামা ইবনে রজব রহ. বলেনঃ মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার জীবনে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনকে একত্র করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আত্মা ও অন্তরের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হবে, সে অবশ্যই

এ জীবন থেকে অনেক কিছুই লাভ করতে পারবে। তবে সে তার দেহ ও শরীরের সব চাহিদা মিটাতে পারবে না। তার দ্বারা তার মানবিক সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না। ইন্দ্রিয় চাহিদাগুলো পূরণ করা তার জন্য সহজ হবে না। কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সে পূরণ করতে পারবে। এতে করে তার দৈহিক জীবনে কিছু ক্ষতি হতে পারে এবং কিছু চাহিদা অপূরণীয় থেকে যেতে পারে। নবী রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীদের জীবন এ ধরনেরই ছিল। তারা তাদের মানবিক জীবনের সব চাহিদা কুরবান করে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের বস্তুগত জীবনের উপকরণগুলো কমিয়ে দেন। পক্ষান্তরে তাদের আত্মার ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপকরণ অফুরন্ত করে দেন। তারা দুনিয়ার জীবনে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন। আর আখিরাতের জীবনেও তাদের জন্য রয়েছে চিরন্তন শান্তি ও অনাবিল আনন্দ। আল্লামা সাহাল আত্ তাসতরী রহ. বলেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার কোন বান্দাকে যে পরিমাণ নৈকট্য ও তার মারেফাত দান করেছেন, সে পরিমাণ তাকে দুনিয়ার জীবন থেকে কমিয়ে দিয়েছেন এবং তার জন্য সে পরিমাণ দুনিয়া হারাম করে দিয়েছেন। আর যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবন থেকে কিছু অংশ দিয়েছেন, সে পরিমাণ অংশ তার জন্য আখিরাত থেকে কমিয়ে দিয়েছেন বা সে পরিমাণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর নৈকট্য ও মারেফাত লাভ হতে সে বঞ্চিত হয়েছে।

১০. দুনিয়ার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী এ বিষয়ে ফিকির করা:

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, "দুনিয়াদার লোকদের দৃষ্টান্ত সে সম্প্রদায়ের কাওমের মত যারা একটি নৌকায় আরোহণ করল, নৌকাটি তাদের নিয়ে একটি দ্বীপের নিকট পৌঁছল। সেখানে পৌছার পর নৌকার মাঝি তাদের পায়খানা পেশাবের জন্য নৌকা হতে নামতে বলল। তারা সবাই পায়খানা পেশাব করার জন্য নৌকা হতে নামল। নামার সময় নৌকার মাঝি তাদের সবাইকে সতর্ক করে বলল তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, অন্যথায় নৌকা তোমাদের রেখে চলে যাবে। আরোহী যাত্রীরা সবাই নৌকা থেকে নেমে পুরো দ্বীপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে গেল। তাদের কেউ কেউ নিজ নিজ প্রয়োজন শেষ করে দ্রুত নৌকায় আরোহণ করল। যারা তাড়াতাড়ি ফিরে আসল, নৌকায় এসে তারা দেখতে পেল নৌকা একেবারেই খালি, তাই তারা তাদের পছন্দমত ভালো ভালো জায়গাগুলো তাদের বসার জন্য বেছে নিল এবং উত্তম ও মনোরম আসনগুলো তারা তাদের বসার জন্য দখল করে নিল। আর কিছু লোক ছিল তারা দ্বীপের মধ্যে অনেক সময় অবস্থান করল; সেখানে তারা সুন্দর সুন্দর ফুল, গাছপালা, তরুলতা ও বাগ বাগিচা দেখতে লাগল এবং বিভিন্ন ধরনের পশু পাখির আওয়াজ ও গান শুনতে লাগল। তারা দ্বীপের সুন্দর সুন্দর পাথর দেখে অভিভূত হল এবং তা উপভোগ করতে লাগল। তারপর তাদের মনে পড়ল নৌকার কথা! আমরাতো আরও দেরি করলে নৌকা হারাবো; নৌকা আমাদের রেখে চলে

যাবে। তাই তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে নৌকায় আরোহণ করল, তখন তারা গিয়ে দেখল নৌকা তাদের আসার আগেই ভরে গেছে। তখন তারা তুলনামূলক সংকীর্ণ জায়গা পেল এবং তাতে তারা বসে পড়ল। আর এক শ্রেণির লোক তারা সুন্দর সুন্দর ও মহামূল্যবান পাথরের উপর একবারে আসক্ত হয়ে পড়ল; তারা কিছু পাথর সেখান থেকে নিয়ে আসল। তারপর যখন তারা ফিরে আসল, তারা দেখতে পেল নৌকায় তাদের পাথর রাখার জায়গা-তো দুরের কথা তাদের জন্যও সংকীর্ণ জায়গা ছাড়া খোলামেলা কোন বসার জায়গা আর অবশিষ্ট নেই। ফলে তাদের বহন-কৃত পাথর তাদের কষ্টের কারণ হল এবং এগুলো তাদের জন্য এক মহাবিপদ হল। লজ্জায় তারা পাথরগুলো ফেলেও দিতে পারছে না এবং বহন করা ছাড়া কোন উপায়ও দেখতে পারছে না। তারপর তারা নিরুপায় হয়ে পাথরগুলোকে তাদের কাঁধে নিল। এতে তারা খুব লজ্জা পাচ্ছিল; কিন্তু তাদের লজ্জা তাদের কোন উপকারে আসেনি। কিছু সময় অতিবাহিত হলে, তাদের ফুলগুলো শুকিয়ে দুর্গন্ধ বের হল এবং উপস্থিত লোকদের কষ্টের কারণ হল। আর কিছু লোক দ্বীপের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দেখে এমনভাবে ডুবে পড়ল, সে নৌকার কথা পুরোই ভুলে গেল এবং উপভোগ করতে করতে অনেক দূরে চলে গেল। নৌকা ছাড়ার সময় যখন মাঝি উচ্চস্বরে তাদের ডাক দিল, তারা তাদের খেল তামাশার কারণে মাঝির চিৎকার একটুও শুনতে পেল না। তারা তাদের কাজেই ব্যস্ত ছিল; কোন সময় ফুলের ঘ্রাণ নেয়, আবার কোন সময় ফল ছিঁড়ে, আবার কোন সময় তারা গাছের সৌন্দর্য অবলোকন করে। তারা এ অবস্থার উপর থাকতে থাকতে এমন একটি সময় আসল, এখন তারা বাঘের আতংকে ভুগতে ছিল, না জানি বাঘ এসে তাদের খেয়ে ফেলে। কাঁটাযুক্ত গাছ তাদের ঘিরে ফেলছে যা তাদের কাপড়কে নষ্ট করে ফেলে এবং পায়ের মধ্যে বিধে। চতুর্দিক থেকে গাছ-পালা ও ডালপালা তাদের উপর ছিটকে পড়ার আশঙ্কায় তারা আতংকিত।

১১. দুনিয়াকে মহব্বত করা হতে বিরত থাকার উপর ধৈর্য ধারণ করা:

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেনঃ "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে কারুণ সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন, একদিন কারুণ অত্যন্ত সেজে গুজে তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট উপস্থিত হল। তার সাথে ছিল খুব সুন্দর সুন্দর যানবাহন ও মূল্যবান পোশাক। চতুর পাশে চাকর-বাকর ও খাদেমগণ ছিল তার নিরাপত্তা প্রহরী। তাকে দেখে যারা দুনিয়ার প্রতি দুর্বল এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের প্রতি লোভী, তারা বলল, হায়! কারুণের মত যদি তাদেরও এ ধরনের ধন-সম্পদ থাকত! ... যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা যখন তাদের কথা শুনল, তখন তারা বললঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আখিরাতে তার মুমিন ও নেককার বান্দাদের যে ছাওয়াব ও বিনিময় দিয়ে থাকেন, তা তোমরা এখন যা দেখছ, তা হতে অধিক উত্তম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

“অত:পর কোন ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুমিয়ে রাখা হেয়েছে, তারা যা করতে তার বিনিময় স্বরূপ [সূরা সেজদা, আয়াত: ১৭]।

“আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু বস্তু তৈরি করছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ কোনদিন শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তর তা চিন্তাও করেনি। তোমরা যদি চাও পড়তে পার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেলঃ

“আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ‘ধিক তোমাদেরকে! আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম যে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য। আর তা শুধু সবরকারীরাই পেতে পারে’ [সূরা কাসাস, আয়াত: ৮০]।

আল্লামা সুদ্দি রহ. বলেন, জান্নাতে কেবল ধৈর্যশীলদেরই প্রবেশ করানো হবে। এ কথাটি যেন যাদের মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর পক্ষ হতে ইলম দেয়া হয়েছে তাদের কথারই প্রতিধ্বনি। আল্লামা ইবনে জারির রহ. বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যারা দুনিয়ার মহব্বত হতে বিরত থাকছেন এবং তার উপর ধৈর্য ধারণ করছেন আর দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ছেন।

সন্তানের সুশিক্ষায় দুনিয়াখ বিমুখতাঃ

সন্তানের সুশিক্ষায় পিতামাতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সন্তানসন্ততি পিতামাতার দর্পনস্বরূপ। পিতামাতা তাদের সাথে যে ব্যবহার করবেন, তাদের মধ্যেও সেই চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হবে। বাল্যকাল থেকেই শিশুর গ্রহণ ও অণুকরণ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। সে যা দেখে তারই অনুকরণ করতে শেখে। তাই তাদের সাথে সর্বদা ভাল আচরণ করা উচিত। সন্তান সন্ততির জন্য পিতামাতার দোয়া যাদুর মতো কাজ করে। শিষ্টাচারপূর্ণ আচার আচরণ শেখার পাশাপাশি আল্লাহর নিকট দোয়া করা উচিত।

মহানবী (সা.) পিতামাতাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘কোনো পিতা তার পুত্রকে উত্তম শিষ্টাচার অপেক্ষা অধিক শ্রেয় আর কোনো বস্তু দান করতে পারে না’ (তিরমিজি)। তাই পিতামাতার উচিত হবে সন্তানদের উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। হাদিসে উল্লেখ আছে, এক সাহাবী মহানবী (সা.)এর কাছে এসে বলেন ‘হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের ওপর পিতামাতার কি হক বা দাবি আছে? তিনি (সা.) বললেন, তারা উভয়েই তোমার বেহেশতও এবং দোযখও’ (ইবনে মাজাহ)। সন্তান যে পরিবেশে বড় হবে তাই সে শিখবে। আল্লাহতায়ালা এ পৃথিবীতে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে থাকেন পরীক্ষা করার জন্য। অনেককে আল্লাহতায়ালা প্রচুর ধনসম্পদ দান করেন

ঠিকই কিন্তু সেই ধনসম্পত্তির সঠিক ব্যবহার না করার ফলে দেখা যায় সে ধ্বংস হয়ে যায় আবার কাউকে সন্তান-সন্তুতি দেন ঠিকই কিন্তু তাদেরকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করার ফলে এই সন্তান তার জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

সন্তান-সন্তুতি যদি প্রকৃত নৈতিকগুণ সম্পন্ন না হয় তাহলে মাতাপিতার জন্য তা একটি আজাব ছাড়া কিছুই না। জীবনবিধান আল কোরআনের সূরা কাহাফের ৪৬ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ধনসম্পদ ও সন্তানসন্তুতি দুনিয়ার সৌন্দর্য। এ সন্তানসন্তুতি যদি আদর্শ চরিত্রের না হয় তাহলে তা হয় মাবাবার জন্য পরীক্ষার কারণ, দুঃখের বোঝা।' আর এজন্যই আল্লাহতায়ালা কোরআন করিমে মুমিনদেরকে হুশিয়ার করে বলেছেন, 'আর জেনে রাখ, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্তুতি পরীক্ষার কারণ (সুরা আনফাল, আয়াত: ২৭)।
আরো বলা হয়েছে, 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও' (সুরা তাহরিম, আয়াত: ৬)।

প্রতিদিন গণমাধ্যমে যে খবরটি নিয়মিত থাকেই তা হল চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি। গণমাধ্যমে এই খবরগুলো খুব ভালো করে স্থান দখল করে নিয়েছে। এমন কোনো দিন বাদ যায় না যে, যেদিন এসব খবর প্রকাশ না পায়। এসব অপকর্ম যারা করে তারাতো কোনো না কোনো পিতামাতারই সন্তান। এছাড়া তারা কোনো না কোনো ধর্মের অবশ্যই অনুসারী। সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, কোনো ধর্মেই এধরণের গর্হিত কাজকে অনুমতি দেয় না।

আমাদের সন্তানদের এত অবক্ষয় কেন? এর কারণ কি? সমাজে যারা নানান অপকর্মে লিপ্ত তাদের সম্পর্কে যদি আমরা একটু খোজ নেই, তাহলে দেখতে পাব যে, তাদের পিতামাতা আসলে তাদেরকে সেভাবে গাইড করেন নাই, যেভাবে করা উচিত ছিল। সন্তানরা কোথায় যাচ্ছে, কাদের সাথে বন্ধুত্ব করছে এসবের কোনো খেয়ালই রাখা হয় না। সন্তানদের সম্পর্কে কোনো চিন্তা নাই বলেই তাদের মাধ্যমে আজ সংঘঠিত হচ্ছে যত ধরণের ঘৃণ্য কাজ। আমাদের সন্তান সম্পর্কে আমরা যদি সচেতন থাকি এবং উত্তম শিক্ষা প্রদান করি, তাহলে কোনো পিতামাতার সন্তানের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয় কারো ক্ষতি করা।

আমরা যদি নেক সন্তান রেখে যেতে পারি, তাহলে দেশ ও জাতির জন্য তা যেমন কল্যাণকর হবে, তেমনই আমাদের মৃত্যুর পরও এ সন্তান আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে থেকে যাবে। সন্তানসন্তুতি আল্লাহতায়ালার দান। কোনো সন্তানই জন্ম থেকে খারাপ হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পিতামাতার অবহেলার কারণেই সন্তান মন্দ পথে পা বাড়ায়।

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিয়ে সুরা তাকাসুরের সতর্কতাঃ

সুরা তাকাসুর পবিত্র কোরআনের ১০২ তম সুরা। সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর রুকু ১, ৮ আয়াত। তাকাসুর শব্দের অর্থ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে। সেদিন তাদের আরাম–আয়েশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

যারা কেবল দুনিয়ার ভোগ–বিলাসকেই জীবনের লক্ষ্য করে তুলেছে, এই সুরায় তাদের পরিণাম নিয়ে কথা বলা হয়েছে। বিলাস–ব্যসনে নিমগ্ন জীবনে মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে হঠাৎ। সব জৌলুস নিভে যাবে। এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে। কেয়ামতের দিন এসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।

সুরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।' দুনিয়ায় মোহ মানুষকে ফিরিয়ে রেখেছে। একজন আরেকজনের কাছ থেকে বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে থাকে। একটি সচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করা খারাপ নয়। কিন্তু পাওয়ার লালসা বড় হয়ে উঠলে এর পেছনে ছোটাই হয়ে ওঠে জীবনের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রতিযোগিতায় নিজের অহংকার ফুলে–ফেঁপে ওঠে এবং অন্যকে পিছিয়ে দেওয়ার মন্দ ইচ্ছা মন দখল করে নেয়।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'যতক্ষণ না তোমরা কবরের সম্মুখীন হও।' কবরে যেতে হবেই। আর সেটাও স্থায়ী নয়। দুনিয়ার মতো সেখানেও শুধু সফর করতে হয়। তুচ্ছ বিষয় অর্জনের প্রতিযোগিতায় প্রাণান্ত হয়ে ছুটতে থাকায় আর কখন মৃত্যুর ঘনিয়ে এসেছে। সব ছেড়ে একদম খালি হাতে কবরে প্রবেশ করতে হয়। কবর এক ভ্রমণপথ। নির্দিষ্ট সময় অব্দি কবরে থাকার পর শুরু হয় কিয়ামত। এর পর বিশ্বাসীদের কাম্য গন্তব্য হলো জান্নাত।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'এ ঠিক নয়, তোমরা শিগগিরই তা জানতে পারবে।' আল্লাহ এই ধারণা ও কর্মকাণ্ডকে সঠিক নয় বলে অভিহিত করেছেন এবং জানার ঘাটতির কথা তুলে ধরেছেন। সঠিকভাবে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ না করায় এমনটি হয়। মানুষ আগে তা বুঝতে না পারলেও অচিরেই তারা জানতে পারবে বলে আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আবার বলি, এ ঠিক নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।' আগের আয়াতের কথাই আবার বলা হয়েছে। এখানে পর পর দুই বার বলার কারণ এটার গুরুত্ব যে বেশি তা বোঝানোর জন্য।

পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের যদি সঠিক জ্ঞান থাকত।’ আল্লাহই আসলে জ্ঞানের মূল উৎস। আল্লাহ জ্ঞান না দিলে আমাদের নিজেদের পক্ষে জানা কখনই সম্ভব না।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই।’ আল্লাহ নিশ্চিত করছেন যে জাহান্নামকে দেখতে পাওয়া যাবে। অনেকে মনে করে, মৃত্যুতেই সবকিছুর শেষ। তাদের জন্য তো বটেই, সবার জন্যই আল্লাহ বললেন, জাহান্নাম অবশ্যই আছে এবং তা নিজ চোখেই দেখা পাবে।

সপ্তম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ‘আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।’ মানুষ জাহান্নাম দেখবে তখন বিশ্বাস স্থাপন করবে।

সব শেষ অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তারপর সেদিন তোমাদেরকে তোমাদের আরাম–উপভোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।’ এখানে পরকালে জিজ্ঞাসাবাদ করার বিষয়টি এসেছে। দুনিয়ার আরাম–আয়েশ লাভ করতে সে দিকে বেশি ঝুঁকে গিয়ে অনেকে আল্লাহ–বিমুখ হয়ে পড়ে। এ নিয়ে প্রশ্ন করা হবে।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নিয়ামতগুলো কী, তার একটা ধারণা এই সুরায় শুরু থেকে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো: সময়, জ্ঞান, চোখ, প্রশ্ন।

সময়: সময় মানুষের জন্য অনেক বড় নেয়ামত, তা কীভাবে ব্যয় করা হবে তার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে।

জ্ঞান: এই নেয়ামতটিই মানুষকে অন্য সব সৃষ্টি থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। জ্ঞান কাজে লাগিয়েই মানুষ ভালোমন্দ বুঝতে পারে।
চোখ: চোখ তথা অন্যান্য ইন্দ্রিয় আল্লাহর দেওয়া বড় নেয়ামত। এসব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নিদর্শন উপলব্ধি করে। প্রশ্ন: প্রশ্ন মানে বিচার। এই প্রশ্ন বা বিচারের কারণেই মানুষ ভালো পথে থাকতে চেষ্টা করে।

সুরা তাকাসুরে বর্ণনা করা হয়েছে যে মানুষ গাফিলতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং সে অবস্থাতেই সে কবরে পৌঁছায়। আর তা–ই তাকে শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে নিয়ে যায়।

দুনিয়া কাফেরদের জন্য জান্নাত এবং মুমিনের জন্য জেলখানাঃ

মানুষের দায়িত্ব হলো জগতের সকল কিছুর মালিক আল্লাহর ইবাদত করা। কিছু মানুষ মনে করে জীবনের উদ্দেশ্য হলো কেবল ধন-সম্পদ অর্জন, ক্রীড়া-কৌতুক, যশ-খ্যাতি ও সন্তান-সন্ততির প্রতিযোগিতা করা। তারা জীবনকে উপভোগ করেই আনন্দ পায়। প্রকৃত পক্ষে মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য সেটি নয়। বরং জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পরিচয় লাভ করা। ঐ সমস্ত মানুষ গুলো সেটি ভুলে গিয়ে পার্থিব জীবনে ভোগ বিলাসেই মগ্ন থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান-১৮৬)।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ ». رواه مسلم

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য বেহেশত (মুসলিম ২৯৫৬, তিরমিযি ২৩২৪, ইবন মাজাহ ৪১১৩, আহমদ ৮০৯০, ২৭৪৯১, ৯৯১৬)।

মুমিন দুনিয়াতে দীর্ঘদিন থাকার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না। কেননা দুনিয়াতে দীর্ঘদিন থাকার ইচ্ছা পোষণ করার মাধ্যমে বিভিন্ন লোভ লালসা তাকে গ্রাস করে ফেলে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য তাই আমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড তারই নির্দেশ মোতাবেক হওয়া জরুরী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাধেঁ হাত রাখলেন এবং বললেন, তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন মুসাফির অথবা বিদেশি। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন,"যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন তোমরা সকালের অপেক্ষা করোনা। আর যখন তোমার সকাল হয় তখন সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করো না। অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে কাজে লাগাও, আর তোমাদের মৃত্যুর জন্য জীবিতাবস্থায় পাথেয় জোগাড় করে নাও। (সহীহ বুখারী-৬৪১৬)।

পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদের প্রচুর পরিমাণ সম্পদ দান করেছেন। যার কারণে সারা পৃথিবীতে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে মুমিনগণ তাদের তুলনায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে অনেক পিছিয়ে। এ অবস্থা দেখে কোনো ঈমানদার বিভ্রান্ত হতে পারবে না। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা দেখতে পাবে যে, কোনো ব্যক্তির পাপকাজ ও নাফরমানি সত্ত্বেও তার বাসনা অনুযায়ী দুনিয়ার অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করছেন, তখন এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ বা ঢিলাদান ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয়না। এরাই হল সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বিনষ্ট হলো। (সূরা হুদ : ১৫-১৬)

দুনিয়ামুখী না হওয়া আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শনঃ

আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন, তাদের মধ্যে পদ-পদবী, অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি—এসব দুনিয়াবি অর্জনে আকর্ষণ থাকে না। আল্লাহ তাআলা কিছু বান্দাকে ভালোবেসেই এসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। চাইলেও তাঁকে এসবকিছু দেওয়া হয় না। মূলত আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে পরিকল্পিতভাবে দুনিয়াবি ফায়দা থেকে সরিয়ে রাখেন। এবিষয়ে অনেক হাদিস পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে- কাতাদা ইবনে নুমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যখন কোনো বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাকে দুনিয়া (প্রাচুর্য) থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমাদের কেউ তার রোগীকে (পানি স্পর্শ করলে যার অসুবিধা হবে,তাকে) পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে।' (তিরমিজি: ২০৩৬)। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ কাউকে দুনিয়া দিলে তিনি আল্লাহর ঘৃণিত ব্যক্তি হয়ে যাবেন। প্রিয় বান্দাদের অনেককে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রাচুর্যও দিয়েছেন। এসব ব্যক্তিদের মধ্যে ওসমান (রা.), সোলায়মান (আ.), দাউদ (আ.)সহ অনেকেই রয়েছেন। তবে তাঁদের কারো মধ্যেই দুনিয়াপ্রীতি ছিল না। সুতরাং 'দুনিয়াবিমুখতা মানে তুমি কিছুর মালিক হবে না, তা নয়; বরং বিমুখতা মানে হলো কোনো কিছু যেনো তোমার মনিব না হয়ে যায়।' (মিজানুল হিকমাহ: ৪/২৯৯০)

বস্তুত, দুনিয়াবি জীবনে সফল হওয়ার নেশা অনেককে আখেরাত ভুলিয়ে দেয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা কেবল আমার ইবাদত করবে' (সুরা জারিয়াত: ৫৬)।

আখেরাত ভুলে দুনিয়ার প্রেমে যারা পাগল, ওসব ভাগ্যহতদের ব্যাপারে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি তার সব চিন্তাকে একই চিন্তায় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট। অন্যদিকে যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে, সে যেকোনো উন্মুক্ত মাঠে ধ্বংস হোক, তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। (ইবনে মাজাহ: ২৫৭)

আখেরাত ভোলা কর্মব্যস্ত লোকগুলো খুবই দুর্ভাগা। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কর্মের মধ্যেই ডুবিয়ে রাখেন। নিমজ্জিত রাখেন হতাশায়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'মহাপবিত্র আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে মগ্ন হও। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করব। তুমি যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর হতাশা দিয়ে পূর্ণ করব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করব না।' (ইবনে মাজাহ: ৪১০৭)

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো, আমি তোমার অন্তর ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব দূর করে দেব। তুমি তা না করলে আমি তোমার দুই হাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব-অনটন রহিত করব না।' (তিরমিজি: ২৪৬৬)

আমাদের উচিত দুনিয়া অর্জনের পেছনে জীবনটা নষ্ট না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। দুনিয়ার জন্য যতটুকু দরকার, শুধু ততটুকুই করা। তবেই, আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, ভালোবাসবেন। আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে পরকাল, আল্লাহ সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্র করে সুসংহত করে দেবেন, তখন তার কাছে দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দেবে।আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির গরিবি ও অভাব-অনটন দুই চোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দেবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়ায় সে এর চেয়ে বেশি পাবে না। (তিরমিজি: ২৪৬৫)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে হেদায়াত দান করুন। দুনিয়ার মরীচিকার মোহ ত্যাগ করে পরকালকে প্রাধান্য দেওয়ার তাওফিক দান করুন। তাঁর ভালোবাসা পাওয়া সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

উপসংহারঃ

অল্পে তুষ্ট থাকা হৃদয়ের ইবাদত। লোভ-লালসার লাগাম টেনে যারা এই ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। জীবন-জীবিকায় নেমে আসে অফুরন্ত বরকতের ধারা। সময়ের ব্যবধানে শত দুঃখ-কষ্ট ও অপূর্ণতায় তাদের কোন আক্ষেপ থাকে না। সুতরাং অল্পে তুষ্ট জীবন আল্লাহর রহমত স্বরূপ, যার সোপান পেরিয়ে দুনিয়াবী শান্তি ও পরকালীন মুক্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়। পক্ষান্তরে পরিতুষ্টহীন জীবন আযাব স্বরূপ, যা ইবাদতের আগ্রহ নষ্ট করে দেয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে। সুতরাং যিন্দেগীর এই সংক্ষিপ্ত সফরে অল্পে তুষ্ট থেকে আখেরাতের শান্তিময় জীবনের প্রস্তুতি নেওয়াই বুদ্ধিমান মুমিনের কর্তব্য। মহান আল্লাহ আমাদেরকে অল্পে তুষ্ট থেকে তাঁর রেযামন্দি হাছিলের তাওফীক্ব দান করুন এবং পরকালে জান্নাতুল ফেরদাঊস দানে ধন্য করুন- আমীন!

তথ্যসূত্র (রেফারেন্স)

১ . ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা লিল বুহুছ ওয়াল ইফতা (ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র) ২৪/৩৬৯।

২ . তাফসীরে কুরতবী [২৫৪/১৭]

৩ . তাফসীরে ইবনে কাসীর ২৪/৮

৪ . তাফসীরে তাবারী ৩০/১৮

৫ . এলামুল মুউকীয়ীন ১৫৩/১

৬ . ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব, (বৈরূত: দারুছ ছাদের, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪হি.) ৮/২৯৮; ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার, (বৈরূত: মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯হি./১৯৭৯খ্রি.), ৪/১১৪ পৃঃ।

৭ . আবুল ফাহ্ল বুস্তী, মাশারিকুল আনওয়ার, (আল-মাকতাবাতুল আতীক্বাহ, তাবি) ২/১৮৭।

৮ . জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, মু'জামু মাক্বালীদিল 'উলূম, তাহক্বীক্ব: ড. মুহাম্মাদ ইবরাহীম উবাদাহ (কায়রো: মাকতাবাতুল আদাব, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪হি./২০০৪ খ্রি.) পৃ. ২০৫, ২১৭।

৯ . https://www.alukah.net/sharia/0/111519

১০ . আল-ক্বানা'আতু ওয়াত তা'আফ্ফুফ, পৃ: ৫০।

১১ . তাফসীরে কুরতুববী ১০/১৭৪; তারফসীর ইবনে কাছীর ৪/৬০১; তাফসীরে বায়যাবী ৩/২৩৯; তাফসীরে মারাগী ১৪/১৩৬।

১২ . মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী, ছাফওয়াতুত তাফাসীর ২/১৩১।

১৩ . মুসলিম হা/১০৫৪; তিরমিযী হা/২৩৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৮; মিশকাত হা/৫১৬৫।

১৪ . তিরমিযী হা/২৩৪৯; ছহীহাহ হা/১৫০৬, সনদ ছহীহ।

১৫ . ইবনু মাজাহ হা/৪১০২; ছহীহাহ হা/৯৪৪; মিশকাত হা/৫১৮৭।

১৬ . বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; তিরমিযী হা/২৩৭৩; ইবনু মাজাহ ৪১৩৭; মিশকাত হা/৫১৭০।

১৭ . তিরমিযী হা/২৩০৫; ছহীহাহ হা/৯৩০; মিশকাত হা/৫১৭১, সনদ হাসান।

১৮ . ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩হি./১৯৭৩খ্রি.) পৃ: ১২৮।

১৯ . ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৪১, সনদ ছহীহ।

২০ . ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪০৭; মিশকাত হা/১৫৬৬।
২১ . তাফসীরে ত্বাবারী ১৭/১৪১।
২২ . শাওক্বানী, তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/১৭১।
২৩ . তিরমিযী হা/২৫১৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪২; মিশকাত হা/৫২৪২।
২৪ . মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৮/৩২৮১; শারহুন নববী ১৮/৭৭।
২৫ . আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, তাহ্ক্বীক্ব ও তা'লীক্ব: ইউসূফ আলী বাদাউয়ী (দামেশক: দারু ইবনি কাছীর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২১হি./২০০০খ্রি.) পৃ. ৪৮৫।
২৬ . শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মুহাক্কিক্ব : শু'আইব আরনাউত্ব ও অন্যান্য (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি.) ৮ম খন্ড, পৃ. ৪০৭।
২৭ . তাফসীরে উসমানী, পৃষ্ঠা : ৪২৭
২৮ . মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।
২৯ . ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৯৮; সনদ ছহীহ।
৩০ . গাযালী, ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ৩/২০৯।
৩১ . ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৫৮।
৩২ . তুওয়াইজিরী, মাওসূ'আতু ফিক্বহিল কুলূব (রিয়াদ: বায়তুল আফকার আদ-দুওয়ালিইয়াহ, তাবি) ৪/৩৩৯৬।
৩৩ . তিরমিযী হা/২৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮; মিশকাত হা/১৬০৭, সনদ হাসান।
৩৪ . ইবনু আবীল হাদীদ, শারহু নাহ্জিল বালাগাহ, ১৮/৩৭৫; মাও'ইযাতুল হাবীব ওয়া তুহফাতুল খাত্বীব, পৃ. ৯৭।
৩৫ . ইবনু আবীদ্দুন্ইয়া, আল-ক্বানা'আতু ওয়াত তা'আফ্ফুফ, পৃ. ৬৩।
৩৬ . আবূ নু'আইম ইসফাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৩৭।
৩৭ . বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩০৬৭; ছহীহুত তারগীব হা/৯২২; মিশকাত হা/১৮৮।
৩৮ . ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/২৫; আর-রিসালাতুল কুশাইরিইয়াহ ১/২৩৩।
৩৯ . সহীহ বুখারী ৩১৫৮, ৪০১৫, মুসলিম ২৯৬১
৪০ . সহীহ বুখারী ১৪৬৫, ৯২২, মুসলিম ১০৫২
৪১ . মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১
৪২ . সহীহ বুখারী ২৮৩৪,২৮৩৫ মুসলিম ১৮০৫
৪৩ . সহীহ বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০
৪৪ . সহীহ মুসলিম ২৮০৭, আহমাদ ১২৬৯৯, ১৩২৪৮

৪৫ . মুসলিম ২৮৫৮, আহমাদ ১৭৫৪৭, ১৭৫৪৮

৪৬ . মুসলিম ২৯৫৭, আবূ দাউদ ১৮৬, আহমাদ ১৪৫১৩

৪৭ . সহীহ বুখারী ৬২৬৮, ১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, মুসলিম ৯৪

৪৮ . সহীহ বুখারী ২৩৮৯,৬৪৪৫,৭২২৮, মুসলিম ৯৯১

৪৯ . সহীহ বুখারী ৬৪৯০, মুসলিম ২৯৬৩

৫০ . সহীহ বুখারী ২৮৮৭, ৭৪৩৫, তিরমিযী ২৫৭৫

৫১ . সহীহ বুখারী ৪৪২, মুসলিম ২৯৫৬, তিরমিযী ২৩২৪

৫২ . সহীহ বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী ২৩৩৩, এবং ইবনু মাজাহ ৪১০২

৫৩ . মুসলিম ২৯৭৭, ২৯৭৮, তিরমিযী ২৩৭২

৫৪ . সহীহ বুখারী ৩০৯৭, তিরমিযী ২৪৬৭

৫৫ . সহীহ বুখারী ৪৪৬১, ২৭৩৯, ২৮৭৩

৫৬ . বুখারী ৪৭৮৬; মুসলিম ১৪৭৫ এবং বুখারি ৪৯১৩

৫৭ . তাফসীরে কুরতবী ১৭/১৩

৫৮ . মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৬২

৫৯ . আবূদাঊদ হা/১৬৪৩; নাসাঈ হা/২৫৯০; মিশকাত হা৮/১৮৫৭, সনদ ছহীহ।

৬০ . ইবনু মাজাহ হা/; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩২৪৪, সনদ ছহীহ।

৬১ . বায়হাক্বী, শুআব হা/১০২৪৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৫০, সনদ ছহীহ।

৬২ . বুখারী হা/৪৪২; মিশকাত হা/৫২৪১।

৬৩ . ইবনু সাঈদ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, তাহক্বীক: আব্দুল ক্বাদের 'আত্বা (বৈরূত; দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০হি.) ৮/৫৩; মাক্বরীযী, ইমতা'উল আসমা' ৬/৪০।

৬৪ . ছহীহ ইবনু হিববান হা/৭০৬; তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৬১৮২; ছহীহাহ হা/১৭১৬।

৬৫ . আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/১৯৭; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ২১/৪৩৪; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৫৪৭।

৬৬ . ইবনুস সুন্নী, আল-কানা'আত, মুহাক্কিক: আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আল-জুদা'ঈ (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশ্দ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯হি.) হা/১০, পৃ. ৪৩।

৬৭ . ইমাম নববী, বুস্তানুল 'আরেফীন (দারুর রাইয়ান লিত তুরাছ, তাবি) পৃ. ৩৫-৩৬।

৬৮ . আব্দুল আযীয তুইয়ান, যুহূদুশ শায়খ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী ফী তাক্বরীরি আক্বীদাতিস সালাফ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল 'উবাইকান, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯হি./১৯৯৯খ্রি.) ১/৩৮-৩৯।

৬৯ . আছেম বিন আব্দুল মুন‘ইম আল-মারী, আদ-দুর্রুছ ছামীন ফী তারজামাতি ফাক্বীহিল উম্মাহ আল্লামাহ ইবনু উছায়মীন (মিসর: দারুল বাছীরাহ, ১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.) পৃ. ২১৮।

৭০ . আদ-দুর্রুছ ছামীন, পৃ. ২১৮-২১৯।

৭১ . মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর অবিচল থাকা ১১৮-১১৯